লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮১ বর্ষ | ১ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ আষাঢ়, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ | ৩১ জিলক্বদ, ১৪৩৯ হিজরি | ১৫ ওফা, ১৩৯৭ হি. শা. | ১৫ জুলাই, ২০১৮ ঈসাব্দ

প্রকাশনার ৯৬ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

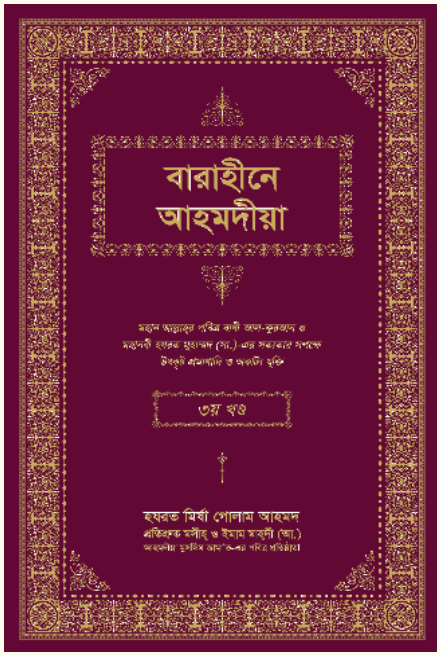

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **‘বারাহীনে আহমদীয়া’**র তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা’লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **‘আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্’** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

‘বারাহীনে আহমদীয়া’র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত, ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তকটি যেন হঠাৎ করেই শেষ হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়। কেননা, তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তক এবং পাদটীকা-২-এর বিষয়বস্তু চলমান রাখা হয়েছে আর যা ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকটির চতুর্থ খণ্ডে গিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।

‘বারাহীনে আহমদীয়া’ পুস্তকটির মূল উর্দু সংস্করণে প্রতিপাদ্য মূলবিষয়, টীকা এবং পাদটীকা একই পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে অনুদিত এই গ্রন্থে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সদয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল পাঠ একটানা ভাবে শেষ করার পর যথাক্রমে টীকা-১১ এবং পাদটীকা ১ ও ২ অংশ সন্নিবেশিত রয়েছে।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ’ বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা’তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত
‘শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া’
পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

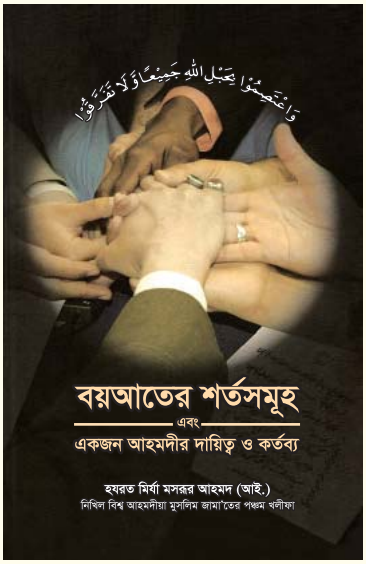

পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি ‘গাইড বুক’ বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা’লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি? প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

সম্পাদকীয়

সাধু সাবধান!
অপশক্তি ছদ্মবেশী শাসককে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা নয়

এই মাসে সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীনে "বোকা বানানোর যে নির্বাচন" পাকিস্তানে হতে যাচ্ছে; সে বিষয়ে যুক্তরাজ্য থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত Prospect Magazine-এ সামিরা শ্যাকল খুবই চমৎকার এক নিবন্ধ লিখেছেন। নিকটবর্তী সময়ে আমাদের দেশেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আর এ প্রেক্ষিতে কোন কোন মহল সামরিক বাহিনীর বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহও দেখাচ্ছে।

সেনা নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের ধোকায় না পরতে তিনি যে পরামর্শ দিয়েছেন তা একেবারে সঠিক, কেননা পাকিস্তানের জন্য এটি একটি যথার্থ সদুপদেশ। কারণ এর মাধ্যমে না পূর্বে সেদেশে তেমন কোন পরিবর্তন এসেছে আর না ভবিষ্যতে আসবে। এভাবে সামিরা হয়তো পাকিস্তানের জন্য ভিন্ন কোন চিন্তা তুলে ধরতে চেয়েছেন।

তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে আমাদের বাংলাদেশের জন্যও বিষয়টি বেশ সংবেদনশীল। ইসলামের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশে সমাজ তথা রাষ্ট্রের কতৃত্ব মোল্লারা নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় বা নেবার অপপ্রয়াস চালায়। পাকিস্তানে এমনটিই সংঘটিত হয়েছে।

পাকিস্তানি সমাজে প্রতিটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ মোল্লাদের করায়ত্তে। এমনকি কেউ যদি এ যুক্তি-তর্কের অবতারণাও করে যে, সেদেশে তো সর্বত্রই সামরিক কতৃত্ব বিরাজমান, তবুও তাকে এ উপসংহারেই পৌঁছাতে হবে যে হাঁটুভাঙ্গা দুর্বল রাষ্ট্রযন্ত্রের সবখানের মতই সেনাবাহিনীরও সার্বিক দায়িত্বভার মোল্লারাই গ্রহণ করেছে।

এসবের শুরু সেই সময়ে যখন পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র সবে এক শিশু রাষ্ট্র, তখনই একে অপহরণ করা হয়েছিল। এই রাষ্ট্রের জন্মের প্রথম তিন বছরের মাথাতেই স্বঘোষিত উগ্র মুসলমান, নিজেদেরকে যারা সাম্প্রদায়িক মুসলমান হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করে, তারাই তথাকথিত "ইসলামী পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র" আখ্যায়িত করে এদেশটিকে তাদের জন্য এক নিরাপদ আখড়ায় পরিণত করে।

আর এভাবে ১৯৫৩ সালে, পাকিস্তানে "একজন মুসলিম"-এর সংজ্ঞা নিরূপনের অধিকার মোল্লাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। মোল্লার দল কেবল নিজ শ্রেণীভুক্তদেরই মুসলমান মনে করে, আর এভাবে নামধারী মুসলিম হিসাবে, মোল্লা-মাফিয়া চক্র গোটা পাকিস্তানি সমাজের হাড্ডি-মাংস-মজ্জা থেকে প্রশাসন, বিচার-বিভাগ, আইন ও বিধানসভাসহ প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে রাষ্ট্রের সার্বিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিয়েছে।

আমেরিকা তাদের সোভিয়েত বিরোধী মিত্র হিসেবে সবসময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। এজন্য যুদ্ধ সংঘাতের উন্মাদনা সৃষ্টি করতে তারা 'ইসলামী জিহাদ'-এর নাম ভাঙ্গিয়েছে। আর এই পথ ধরেই মোল্লারা পাকিস্তান সেনা-কতৃত্বের কেন্দ্র নিজেদের দখলে নিয়েছে।

পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে জিয়াউল হক-এর অভ্যুত্থান সেনাবাহিনীকে ধর্মীয় ফতোয়া প্রদানের একটি কারখানায় পরিণত করে। সাধারণভাবে একটি সামরিক বাহিনীর মৌলিক দায়িত্ব যেখানে দেশের সীমান্ত রক্ষা করা, অথচ এর পরিবর্তে জেনারেল জিয়াউল হক তুলনামুলকভাবে ধর্মীয় বিষয়াদিতে অনেক বেশী নাক গলায়। তার জারীকৃত কুখ্যাত অধ্যাদেশ নম্বর-২০, যাতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত 'কী করবে' আর 'কী করবে না', এর সীমারেখা টানা হয়, এ ছিল এক জঘন্য আইনী পদক্ষেপ। এটি অত্যন্ত লজ্জাস্কর যে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা এক ব্যক্তি স্বৈরশাসকরূপে এ হীন কাজটি করেছে। এথেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, মাফিয়াচক্র নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানের অন্যসব রাষ্টযন্ত্রের ন্যায় সেই দেশের সেনাবাহিনীও চরমপন্থী মোল্লাদেরই দখলে।

পাকিস্তানে বেনজির ভুট্টোর সরকার উৎখাত এবং ১৯৯৫ সালে সমগ্র সেনাকমান্ড হত্যা করার চক্রান্ত, অন্য কেউ নয় বরং উচ্চ পদস্থ সেনাকর্মকর্তাদের একটি গ্রুপ কারি সাইফুল্লাহর নেতৃত্বে বাস্তবায়িত করে, আর এর পেছনে দৃঢ় সমর্থন ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থী গ্রুপ হরকত-উল-জিহাদ আল-ইসলামি। ২০০৯ সালে, নিষিদ্ধ চরমপন্থী গ্রুপগুলোর সঙ্গে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ৫৭ জন কর্মকর্তার যোগ-সাজশ খুঁজে পাওয়া যায়।

পাকিস্তান সেনাঘাটি মেহরান বেসে সংঘটিত আক্রমণ– যার দায়িত্ব তেহরিক-ই-তালেবান গ্রহণ করে, আর এই হামলার পুরোটাই চালানো হয় ক্যাম্পের ভিতরে সৈন্যবাহিনীতে ঘাপটি মেরে থাকা চরমপন্থীদের দ্বারা, এই আক্রমণে অংশগ্রহণকারী জঙ্গিদেরকে ইউনিফর্ম পরিহিত এবং সেনাব্যাজ লাগানো অবস্থায় দেখা গেছে। এজন্য ঘাটির সুবিধাসমূহ তারা ভালই জানতো আর ব্যবহারও করেছে সেভাবেই।

সুতরাং, পাকিস্তানি রাজনীতি আর সামরিকবাহিনীর অবস্থানগত যে বিশ্লেষণ সামীরা তুলে ধরেছেন সেদিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের শীর্ষ নেতাদের এবং জনগণের বিশেষভাবে সজাগ ও সচেতন থাকা জরুরী। কেননা চোখ মেলে তাকালেই দু'দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

তাই প্রিয় পাঠক, সময় থাকতেই বলছি–

সাধু সাবধান!

সূচিপত্র

১৫ জুলাই, ২০১৮

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ৬
প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৮
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
৩১ জুলাই ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ১৭
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

আমি কিভাবে আহমদী হলাম ২০
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

কলমের জিহাদ ২৩
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ফযিলত ২৭
আনোয়ারা বেগম

দরূদ শরীফ পড়ার গুরুত্ব ও ফযিলত ২৯
মাওলানা ফুরাদ আহমদ

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও বয়আত করার গুরুত্ব ৩০
আব্দুল খালেক তালুকদার

নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৩২
মামুন-উর-রশীদ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি– **যুক্তরাজ্য মজলিসে শূরার উদ্দেশ্যে আহমদীয়া মসুলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধানের ভাষণ** ৩৬

সংবাদ ৩৮

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা ৪৩

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী ৪৪

প্রচ্ছদ পরিচিতি: বহির্বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সালানা জলসা– কানাডার ৪২তম সালানা জলসা ২০১৮ (অনুষ্ঠানকাল: ৬-৮ জুলাই)।

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র
সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ۫ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۶۳﴾

৬৩। সে (আরো) বললো, 'বল, একেই কি তুমি আমার উপর প্রাধান্য দান করে সম্মান দিয়েছো? তুমি আমাকে কিয়ামত[১৬৩০] দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিলে আমি অবশ্যই অল্প ক'জন ছাড়া এর বংশধরের (সবাইকে) ধ্বংস করে ছাড়বো'[১৬৩১]।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿۶۴﴾

৬৪। তিনি বললেন, 'দূর হও। তাদের মাঝে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তোমাদের সবার পুরোপুরি প্রতিফল।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۶۵﴾

৬৫। আর তাদের মাঝে যাকে পার তাকে তুমি তোমার কণ্ঠস্বর দিয়ে বিপথগামী কর। আর তুমি তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীসহ তাদের উপর চড়াও হও, তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদেরকে[১৬৩২] প্রতিশ্রুতি দাও।' আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে তা কেবল প্রতারণার উদ্দেশ্যেই (দিয়ে থাকে)।

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿۶۶﴾

৬৬। নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য[১৬৩৩] থাকবে না এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকই কার্যনির্বাহক হিসাবে যথেষ্ট।

১৬৩০। 'পুনরুত্থানের' মর্ম এখানে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান, যার সম্বন্ধে প্রত্যেক মুমিনের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ হয় যখন তার ঈমান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। তখন শয়তান তাকে আর কাবু করতে পারে না।

১৬৩১। মানবজাতির এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান যে ভীতি প্রদর্শন করেছিল তাতে সে কতটা সাফল্য লাভ করেছে? এই প্রশ্নটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যার উত্তর দেয়া প্রয়োজন। পৃথিবীতে শুভ ও অশুভ এর উপর আপাত ও দ্রুত দৃষ্টি ফিরালে কোন ব্যক্তি এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না, অশুভ বা অসৎ কিংবা পাপী বা দুর্বৃত্তরা প্রভাব এবং প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে সৎ, শুভ বা ধার্মিকের উপরে। এক কথায় কল্যাণের উপর অকল্যাণ টেক্কা মেরে চলেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এর বিপরীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি সর্বপ্রধান মিথ্যাবাদীর সকল উক্তি পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, তার সত্য কথাগুলোর সংখ্যা উৎকর্ষতায় তার মিথ্যাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একইভাবে পৃথিবীতে দুষ্ট এবং অসৎ লোকের সংখ্যা সৎ এবং ধার্মিক লোকের তুলনায় অনেক কম। প্রকৃত অবস্থা হলো এই, দুষ্টামী বা পাপাচার এত ব্যাপকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, তা নিজেই এই বাস্তব অবস্থার প্রমাণ যোগায়, মানবপ্রকৃতি জন্মগতভাবে ভালো এবং তা অমঙ্গলের সামান্যতম স্পর্শেও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। অতএব এটা বলা ভুল, শয়তান তার ভীতি প্রদর্শনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

১৬৩২। এই আয়াতে মানুষকে প্রলুব্ধ করে সৎ পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তানপ্রকৃতির লোকদের তিন প্রকার কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে: (১) তারা দরিদ্র ও দুর্বলকে হিংস্রতার ভয় দেখিয়ে বশে আনতে চায়, (২) হিংস্রতার মৌখিক ভীতি প্রদর্শনে যারা ভীত হয় না তাদের বিরুদ্ধে তারা কঠোর পন্থা অবলম্বন করে। তাদের বিরুদ্ধে পরস্পরের সহযোগিতায় পরিকল্পিত আক্রমণ চালায় এবং তাদেরকে সর্বপ্রকার নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকারে পরিণত করে এবং (৩) তারা ক্ষমতাশালী এবং অধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে প্রলোভনের মাধ্যমে দলে ভিড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায় এবং যদি তারা শুধু সত্যের সমর্থন করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদেরকে নেতা বানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

১৬৩৩। মানুষের আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান না ঘটা পর্যন্ত সে শয়তানী প্রলোভনের শিকার হতে পারে, অর্থাৎ যে পর্যন্ত তার ঈমান পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হয় সে পর্যন্ত শয়তানের দল তাকে (মানুষকে) বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে।

হাদীস শরীফ

মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা.)

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমার আগমনের উদ্দেশ্য উত্তম-চরিত্র ও আদর্শের পূর্ণতা দান করা"

কুরআন ঃ

"নিশ্চয় তোমাদের এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যে আল্লাহ্‌র ও পরকালের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অনেক বেশী স্মরণ করে"।

(সূরা আল আহযাব : ২২)

হাদীস ঃ

* হযরত আমের (রা.) অত্যন্ত পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে, জিজ্ঞাসা করলেন, "হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন।" "হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তুমি কি কুরআন পড় নাই?" হযরত আমের (রা.) বললেন, "কেন (পড়ব) না" তিনি বললেন, "হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর চরিত্র তো কুরআনই ছিল" (নিসাঈ)।

* হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, "হযরত রাসূল করীম (সা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী" (মুসলিম)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমার আগমনের উদ্দেশ্য উত্তম-চরিত্র ও আদর্শের পূর্ণতা দান করা" (আল আদাবুল মুফরাদ)।

* হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) বলেছেন, "নবী করীম (সা.) প্রকৃতিগতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না" (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)।

এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর আদর্শ সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, "কুরআন শরীফে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর উত্তম চরিত্রের যে উল্লেখ রয়েছে, তা হযরত মূসা (আ.) অপেক্ষা সহস্র গুণে উত্তম। কারণ আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর মধ্যে সেই সব উত্তম-চরিত্র, গুণ একত্র হয়েছে, যেগুলি বিভিন্ন নবীর মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় ছিল। আল্লাহ্ তাআলা আঁ-হযরত (সা.) সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন, 'ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম' অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের ওপর দন্ডায়মান আছ। 'আযীম' শব্দটি দ্বারা যখন কোন বস্তুর তা'রীফ করা হয়, তখন আরবী বাক্‌ধারায় তা দ্বারা ঐ বস্তুর চরম ও পরম কামালিয়াত (পূর্ণতা) বুঝায়। মানবাত্মার মধ্যে যত উত্তম চারিত্রিক-গুণ ও মধুর আচরণ বিদ্যমান থাকা সম্ভব, ঐ সব চারিত্রিক গুণ পূর্ণ মাত্রায় মুহাম্মদীয় সত্ত্বায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তাঁর এই তা'রীফ এত উচ্চাঙ্গের যে, এর চেয়ে অধিক তা'রীফ সম্ভব নয়"। (বারাহীনে আহমদীয়া)

অমৃতবাণী

মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদা আপনাদের প্রতি করুনা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার প্রভু প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝা আমার জন্য সহজ করেছেন আর জীবন-যাত্রার সব সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন আর আমাকে আমার আমিত্বের গৃহ থেকে মুক্ত করে সংগোপনে তাঁর সুমহান ও বিশাল গৃহ অভিমুখে আমাকে নিয়ে গেছেন। জল-স্থল পাড়ি দিয়ে যখন আমি প্রকৃত ক্বিবলায় পৌঁছলাম এবং তাঁর মনোনীত গৃহ প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম আর আমার বন্ধু ও মূর্তিমান ভালবাসা, প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র স্নেহের সুদৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রখরতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝার ক্ষেত্রে যখন আমাকে বিশেষত্ব প্রদান করল আমি তখন আমার পূর্ণ অস্তিত্বকে তাঁর হাতে সঁপে দিলাম।

আমি তাঁর পক্ষ থেকে সব সূক্ষ্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে ব্যুৎপত্তি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান সব বিবাদের প্রতি আমি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করছি। আমি সব বিতর্কের উৎস ও কারণ সন্ধান করেছি। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্র বাদ রাখিনি বরং সুনিশ্চিতভাবে আমি এর মূল খুঁজে বের করেছি।

আমি বুঝতে পেরেছি, **বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে ভুল-ভ্রান্তি করছে, একটি দিককে উপেক্ষা করে অন্য আরেকটি দিককে অবলম্বন করাই হলো এর মূল কারণ। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তারা একটি আঙ্গিককে বড় করে দেখে আর এর বিপরীত মতামতকে তুচ্ছ ও খাটো মনে করে। কাঙ্খিত কোন কিছুর ভালবাসায় মত্ত হলে প্রবৃত্তি এর বিরোধী সব বিষয়কে ভুলে বসে–এই হলো মানবস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তখন সে সহানুভূতিশীলদের সদুপদেশকেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না বরং বেশীর ভাগ সময় তাদের বিরোধিতা করে আর তাদেরকে শত্রু মনে করে। তখন সে তার হৃদয়ের অস্বচ্ছতার কারণে তাদের সান্নিধ্যে যায় না আর তাদের কথাও মন দিয়ে শোনে না।**

এ আত্মিক বিপত্তির নানা কারণ ও হেতু রয়েছে আর বিভিন্ন পথ ও পন্থা দিয়ে এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর সবচেয়ে বড় কারণগুলো হলো, হৃদয়ের কাঠিন্য, পাপে আসক্তি, পরকালে জবাবদিহিতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শত্রুদের সাথে সখ্যতা। মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া তার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব আমরা এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রায়শ এসব বদ-অভ্যাসই মানুষকে বিবাদ-বিতন্ডার সময় গভীর হঠকারিতার পথে ঠেলে দেয়। সত্যান্বেষী ও হেদায়াত সন্ধানী একজন মানুষের জন্য কু-প্রবৃত্তির খাতিরে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে জীবননাশী এক বিষ। এ ফাঁদে পতিত মানুষ খুব কমই রক্ষা পায়। কখনও কখনও এসব অসৎ কারণ এবং বিভ্রান্তিকর হেতুগুলো প্রচ্ছন্ন ও দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তা দেখতে পায় না আর মনে করে, সে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে। সে তড়িঘড়ি করে যখন বিতন্ডায় লিপ্ত হয় আর বিবাদ-বিসম্বাদে ক্রমশ: উগ্র হয়ে উঠে, এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি তুচ্ছ ধারণা এবং দুর্বল অভিমতকে জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করে, যার ফলে তার চালচলনে অহংকারীর হাবভাব দেখা যায়। এসব কিছুর কারণ হলো, গভীর মনোযোগের অভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, সত্য-জ্ঞানের স্বল্পতা, সামাজিক কদাচারের দাসত্ব, রিপুর পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার, আধ্যাত্মিক রুচিশূন্যতা, উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং জড় জগতের প্রতি পূর্ণ আসক্তি এবং এর অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ।

[‘সির্‌রুল খিলাফাহ্‌’ পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৩-১৪]

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১০ম কিস্তি)

এখন এ প্রশ্নটিও সমাধানযোগ্য যে, 'মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম তো দাজ্জালের জন্য আসবেন। আপনি যদি মসীহ্-ইবনে-মরিয়মরূপে এসে থাকেন তাহলে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাজ্জাল কে?' আমার পক্ষ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর হল, যদিও আমি এ বিষয়টি স্বীকার করি যে সম্ভবত: আমার পরে আরও কেউ 'মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম' রূপে আসতে পারেন এবং কোন কোন হাদীস অনুসারে মুসলমানদের মাঝে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আরও দাজ্জালও আসবে।

কিন্তু আমার 'মাযহাব' (অভিমত) এটি যে, এযুগের পাদ্রীদের মতো এযাবৎকাল কোন দাজ্জাল সৃষ্টি হয়নি এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত হবেও না। মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, **"ওয়া আন ইমরান-ইবনে-হুসাইন কালা সামি'তু রসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইয়াকুল মা বাইনা খাল্‌কি আদামা ইলা কিয়ামিস্‌সা'আ আমরুন্ আক্‌বারু মিন দাজ্জালি"** অর্থাৎ ইমরান বিন হুসাইন হ'তে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আদমের সৃষ্টিকাল থেকে কিয়ামতকাল অবধি নৈরাজ্য ও পরীক্ষা হিসেবে দাজ্জালের বিষয়ের চেয়ে বৃহত্তর কোন বিষয় নেই (অর্থাৎ পাদ্রীদের ব্যাপাটিই সবচেয়ে বৃহৎ ও গুরুতর –অনুবাদক)। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অভিধানে 'দাজ্জাল' মিথ্যুক ও প্রবঞ্চকদের দলকে বলা হয় যারা সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মেশায় এবং মানুষকে বিপথগামী করার জন্য সূক্ষ্ম কারসাজি ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়, এগুলো কাজে লাগায়। আমি দাবীর সাথে বলছি, 'সহী মুসলিম' বর্ণিত যে হাদীসটি আমি এইমাত্র উদ্ধৃত করলাম এর মর্ম অনুযায়ী হযরত আদমের সৃষ্টিকাল থেকে আজ অবধি যে-সব লিখিত প্রমাণপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ আমরা খুঁজে পাই সেগুলোর মাধ্যমে আমরা যদি দুনিয়া জুড়ে এমন সব লোকের অবস্থায় দৃষ্টিপাত করি যারা দাজ্জালী কার্যকলাপের দায়িত্বভার নিজেদের জিম্মায় তুলে নিয়েছিল, তাহলে পাদ্রীদের ছাড়া অন্য কেউ কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না। এ লোকগুলো এক কল্পিত, কৃত্রিম ও খেয়ালী মসীহ্ নিজেদের সামনে নির্ধারণ করেছে যেটি তাদের কথা মোতাবেক জীবিত এবং খোদা হওয়ার দাবী করছে।

অতএব হযরত ঈসা-মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম কখনও খোদা হওয়ার দাবী করেন নি। এ লোকগুলো নিজেরা তাঁর উকিল সেজে তাঁর পক্ষ থেকে খোদা হওয়ার কাল্পনিক দাবী প্রচার করছে এবং এই দাবী সজীব ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য তারা কি কতকিছু প্রক্ষেপ করেনি? কতকিছু মিথ্যাচার ও প্রতারণার আশ্রয় নেয় নি? মক্কা ও মদীনা বাদে এমন কোন্ জায়গা আছে যেখানে তারা পৌঁছায় নি? এমন কোন ধোকা দেওয়ার কাজ বা বিপথগামী করার অভিসন্ধি অথবা বিভ্রান্ত করার কোন পদ্ধতি এমনও কি আছে যা তারা কার্যে পরিণত করে দেখায় নি? এটা কি সত্য নয় যে, এ লোকগুলো তাদের দুরভিসন্ধির কারণে একজগৎ জুড়ে সেখানে তাদের মিশন স্থাপন করে সেখানকার বৃহদাংশকে তারা ওলট-পালট করে দেয়? তারা এত সম্পদশালী যে দুনিয়ার সমস্ত ধনভান্ডার যেন তাদের পেছনে ছুটে যায়। যদিও ধর্মগুলোর

সাথে ইংরেজ সরকারের কোন সংস্রব নেই। স্বীয় সাম্রাজ্যের কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাদ্রী সাহেবদেরও আলাদা এক সরকার রয়েছে যেটি অগাধ অর্থের মালিক। যা বিশ্বজুড়ে ডাল-পালা ও নিজেদের যোগড়যন্ত্র ছড়িয়ে চলেছে। এক ধরনের স্বর্গ ও নরক তারা নিজেদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে। যে ব্যক্তি তাদের ধর্মের আওতায় আসতে চায় তাকে স্বর্গ দেখানো হয় আর যে তাদের ঘোর বিরুদ্ধে যায় তার জন্য থাকে নরকের হুমকি। তাদের আয়ত্তে রয়েছে বিশাল খাদ্যসামগ্রী যা তাদের সাথেই থাকে যেখানেই তারা থাকুক না কেন। অধিকাংশ ভুক্ষা-নাঙ্গা মানুষ তাদের লোভনীয় খাদ্যভান্ডারে প্রলুব্ধ ও বিমোহিত হয়ে 'রাব্বুনাল মসীহ্, রাব্বুনাল মসীহ' (মসীহ্ আমাদের রব, মসীহ্ আমাদের রব) জপতে শুরু করে। মসীহ্ সম্পৃক্ত দাজ্জালের এমন কোন আলামত বা চিহ্ন নেই যা তাদের মাঝে চাক্ষুষভাবে বিদ্যমান নয়। এক হিসেবে তারা মৃতদেরও জীবিত করে এবং জীবিতদেরও মেরে ফেলে। (সমঝদারদের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ঠ)। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের একটাই মাত্র চোখ আর সেটি বাঁ চোখ। যদি তাদের ডান চোখ থাকত তাহলে এলোকগুলো খোদাকে ভয় করত এবং (মসীহ্ সম্পর্কে) খোদা হওয়ার দাবী থেকে নিবৃত্ত হত। নিঃসন্দেহে এও সত্য যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এ দাজ্জালজাতির বর্ণনা রয়েছে। হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়মও ইঞ্জিলে অনেক কছিু উল্লেখ করেছিলেন এবং পূর্ববর্তী সহিফাসমূহেও তাদের সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। নি:সন্দেহে এমনটিই আবশ্যকীয় ছিল যে প্রত্যক নবীই মসীহ্ সম্পৃক্ত দাজ্জালের বহির্প্রকাশ সম্পর্কে পূর্ব থেকে সংবাদ জানতেন। তাই প্রত্যেকে বিস্তারিত বা সংক্ষেপে অথবা ইঙ্গিত ইশরায় এর সম্পর্কে জ্ঞাত করেছেন। হযরত নূহ (আ.) থেকে আমাদের নেতা ও মনিব খাতামাল-আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগ অবধি এই মসীহ্ সম্পৃক্ত দাজ্জাল সম্পর্কে সংবাদ বিদ্যমান। যা আমি দলিল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করতে পারি।

উল্লিখিত এ লোকদের হাতে ইসলামের যে পরিমাণ ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে আর যে-পরিমাণ তারা সত্য ও ন্যায়কে হত্যা করেছে– এ যাবতীয় অনিষ্টের কে-ই বা অনুমান করতে পারে?! পবিত্র হিজরতের তেরো শতাব্দীর পূর্বে এসব নৈরাজ্যের নাম-নিশানাও ছিল না। যখন হিজরী তেরো শতাব্দীর প্রায় অর্ধেকের কিছু বেশি অতিবাহিত হলো তখন হঠাৎ উল্লিখিত দাজ্জাল দলটির বহির্প্রকাশ ঘটলো। এরপর উন্নতি হতে থাকল। পরিশেষে এই একই শতাব্দীর শেষ ভাগে পাদ্রী হ্যকার সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী কেবল ভারতবর্ষেই খ্রিষ্টান ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা পাঁচলাখে দাঁড়ালো। অনুমান করা হয়, প্রায় বার বছর সময়কালে এক লাখ মানুষ খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষত হয়। যারা আল্লাহ্‌র অসহায় এক বান্দাকে খোদা বলে ডাকে। কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি এ বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞাত নয় যে ইসলামের এক বিপুল সংখ্যক দল বা অন্য কথায় মুসলমানদের মাঝে ভুক্ষা-লাঙ্গা লোকের একটি বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে পাদ্রী সাহেবরা শুধু খাবার ও কাপড়ের প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের কুক্ষীগত করেছে। আর খাদ্যের মাধ্যমে যাদের কাবু করতে পারে নি তাদেরকে তারা মেয়েলোকদের মাধ্যমে বশ করেছে। আর যারা এই ফাঁদে ধরা পড়েনি তাদের জন্য ধর্মের প্রতি অনুরাগ বিনাশী দর্শন ছড়ানো হয়েছে যার প্রভাব বলয়ে আজ মুসলমানদের লক্ষ লক্ষ কোমলমতি সন্তানরা গ্রেপ্তার হিসেবে দেখা যায়– যারা নামায-রোযার প্রতি হাসি-বিদ্রুপ করে থাকে এবং ওহী-ইলহামকে দুঃস্বপ্নের মতো কিছু ভাবে। আর যারা পাশ্চাত্যের দর্শন শেখারও যোগ্য ছিল না তাদের জন্য তারা বহু সংখ্যক বানোয়াট কেস্‌সা-কাহিনী যা তৈরী করে দেখানো পাদ্রী সাহেবদের বাঁ হাতের খেলাস্বরূপ অতি সহসাধ্য ছিল। এগুলোতে কোন বিকৃত ইতিহাস বা গল্প-কাহিনীর আকার ও আবরণে ইসলামের কুৎসা তুলে ধরা হয়েছিল তা ছেপে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় ও বিস্তার দেওয়া দেয়া হয়। তাছাড়া ইসলামধর্মের খন্ডনে এবং আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ও প্রত্যাখ্যানে বিপুল সংখ্যক বই-পুস্তক প্রণয়ন করে এই লোকগুলো জগৎময় বিনা মূল্যে বিতরণ করেছে এবং অধিকাংশ পুস্তকের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। সদ্য রচিত আমার পুস্তিকা 'ফাত্‌হে-ইস্‌লাম'-এর ৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা পড়ে দেখুন ঃ 'বিগত একুশ বছরে এলোকগুলো তাদের প্রবঞ্চনামূলক ধ্যান-ধারণা বিস্তার দেয়ার জন্য সাত কোটিরও অধিক বই-পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করেছে যাতে মানুষ কোনো ক্রমে ইসলাম ধর্ম থেকে সরে যায় এবং ঈসা মসীহ্‌কে খোদা বলে মেনে নেয়। **আল্লাহু-আকবার! এখনও যদি আমাদের (মুসলমান) জাতির দৃষ্টিতে উল্লিখিত এ লোকগুলো চরমপর্যায়ের দাজ্জাল নয় এবং তাদের অভিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে (আল্লাহ্ প্রেরিত) একজন সত্য মসীহ্‌র আবশ্যকতা নেই তাহলে এজাতির কী অবস্থা দাঁড়াবে?!**

(চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

জুমুআর খুতবা

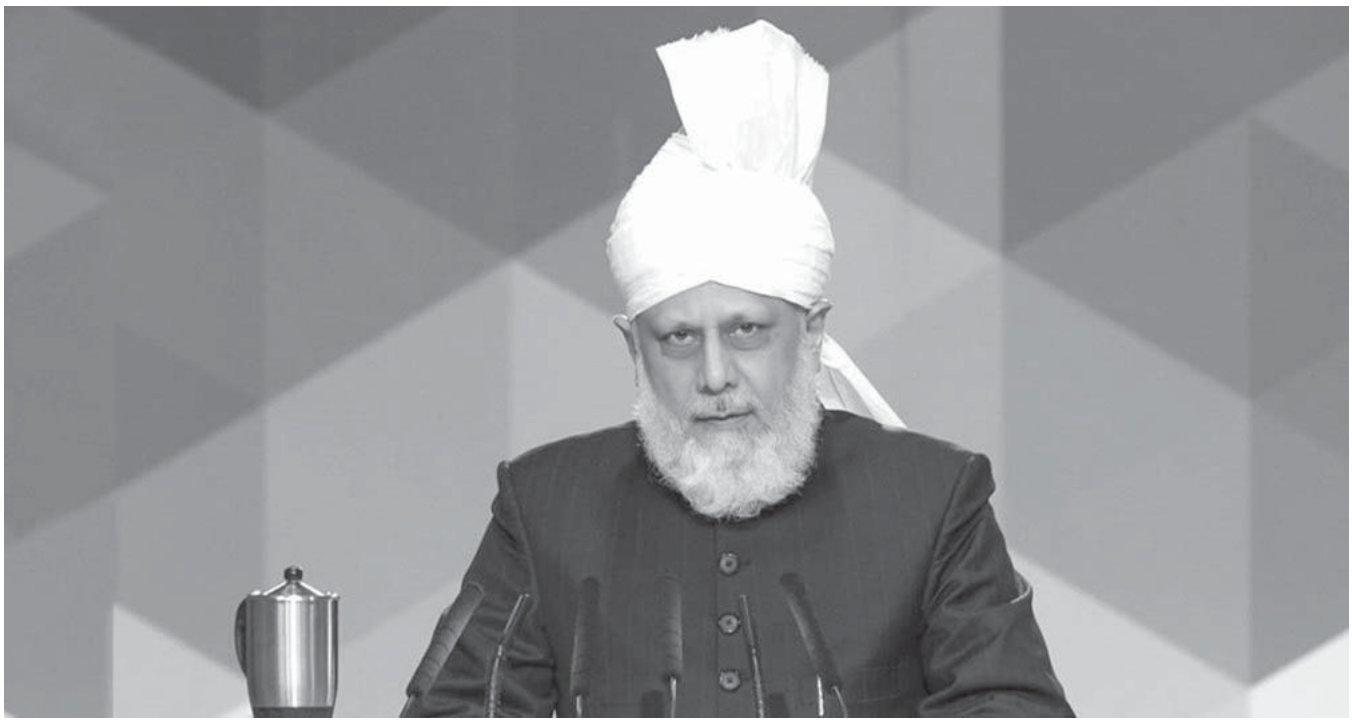

আল কুরআনের প্রতি অনুরাগ ও নিষ্ঠা

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ৩১ জুলাই ২০১৫'র জুমুআর খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

কুরআন পাঠের প্রয়োজনীয়তা এবং...

সম্প্রতি কেউ স্বল্পদৈর্ঘ্য একটি ভিডিও দেখিয়েছে, তাতে এক আফ্রিকান মৌলভী বয়স্কদেরকে কুরআন পড়াচ্ছিল আর সামান্য ভুলের কারণে বেত্রাঘাত করে তাদের অবস্থা শোচনীয় করে তুলছিল। ভাষা যার ভিন্ন আর বয়সও যদি তার সতের-আঠার বা এর বেশি হয়, এমন মানুষের জন্য কীভাবে ক্বারীদের মত প্রতিটি অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারণ করা সম্ভবপর হতে পারে? ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হল, মানুষ কুরআন পাঠ করার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এ কারণেই মুসলমানদের অনেকেই পবিত্র কুরআন পাঠ করতে জানে না। আমি বিশেষ করে অনারবদের কথা বলছি।

অতএব, **কুরআন পড়া যদি শেখাতে হয়, তাহলে এমনভাবে পড়ানো উচিত, যার ফলে কুরআনের প্রতি গভীর আগ্রহ এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।**

সম্প্রতি এক জাপানি ভদ্রমহিলা সাক্ষাতের জন্য আসেন, যিনি এখানে বসবাস করেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি বয়আত করেছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, তিন বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শেষ করেছেন আর কিছুটা শোনানোরও আগ্রহ ব্যক্ত করেন। আমি বললাম, ঠিক আছে শোনান। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তিনি এমনভাবে আয়াতুল কুরসী পাঠ করেন যে, আশ্চর্য হতে হয়। তাই আসল বিষয় হল, কুরআনের প্রতি এমনই ভালোবাসা থাকা উচিত আর হৃদয়ের গহিন থেকে এটি পাঠ করা উচিত। শুধু লোক-দেখানোর জন্য ক্বারীদের ন্যায় গলা থেকে শব্দ বের করাই উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ্ তা'লা 'তারতীল'-এর সাথে বা ধীরে ধীরে সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াতের

নির্দেশ দিয়েছেন। যতটা সম্ভব সঠিক উচ্চারণের সাথে পড়া উচিত। আমরা যদি দাবি করি যে, আমরা আরবদের মত শব্দ উচ্চারণ করতে পারি, তাহলে এমনটি (হবে) অসম্ভব দাবি। অনারবরা কোন কোন অক্ষরের উচ্চারণ সঠিকভাবে করতেই পারবে না। তবে সে যদি আরবদের মাঝে লালিতপালিত হয়, তাহলে ভিন্নকথা। জাপানি জাতিও কোন কোন অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। যেমন, এই যে ভদ্র মহিলা পড়েছেন, তার উচ্চারণে 'হে' এবং 'খে'-এর পার্থক্য ছিল না বা 'খে' এমনভাবে উচ্চারণ করছিলেন, যাতে স্পষ্টভাবে 'হে'ই শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু একজন জাপানি মহিলার কাছ থেকে তিলাওয়াত শুনে আমার মাঝে এই উপলব্ধি সৃষ্টি হয়েছে যে, সব জাপানি না হলেও অনেক জাপানি এই ভদ্রমহিলার মতই হবেন, যাদের জন্য অনেক অক্ষর উচ্চারণ করা কষ্টসাধ্য। যাহোক, আসল বিষয় হল আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র বাণীর প্রতি ভালোবাসা। যতটা সম্ভব সঠিকভাবে তা উচ্চারণের চেষ্টা করা উচিত। ক্বারী হওয়া এবং লোক দেখানোর মানসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যেন উদ্দেশ্য না হয়। হযরত বেলাল (রা.)-এর 'আশহাদু'-এর পরিবর্তে 'আস্‌হাদু' বলার প্রতি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর যে স্নেহদৃষ্টি ছিল, কোন ক্বারী বা কোন আরব তার মোকাবিলা করতে পারবে না। (খুতবাতে মাহমুদ, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৪৭০)

অতএব, অমুসলমানদের মধ্য থেকেও মানুষ জামা'তভুক্ত হচ্ছে এবং ইসলাম গ্রহণ করছে। যেমনটি আমি বলেছি, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি কুরআন পড়তে জানে না। আফ্রিকায় আমাদের মুবাল্লেগরা অনেক ক্ষেত্রে এমন বিষয়ের সম্মুখীন হন, যেখানে তাদেরকে নতুনভাবে কুরআন পড়াতে হয়, বরং শুরু থেকে তাদেরকে কায়দা পড়াতে হয়। অতএব, এমন লোকদেরকে কুরআন পড়াতে হবে। কুরআনের শিক্ষকদের উচিত এমনভাবে কুরআন পড়ানো, যেন কুরআনের প্রতি গভীর আগ্রহ জাগে। আল্লাহ্ তা'লা সেই পাকিস্তানি ভদ্রমহিলাকেও প্রতিদান দিন, যিনি এই জাপানি মহিলাকে কুরআন শুধু পড়ানই নি বরং এমন মনে হয় যেন কুরআনের প্রতি তার মাঝে ভালোবাসাও সৃষ্টি করেছেন।

অতএব, কেবল ক্বারীর ন্যায় ক্বিরাআত করাই আসল বিষয় নয়। আর এমনটি ভাবা উচিত নয় যে, এভাবে শব্দ উচ্চারণ করতে না পারলে কুরআন পড়াই ছেড়ে দেবো। কুরআন পড়া আবশ্যক আর এক্ষেত্রে মানোন্নয়নের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু আমরা কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারি না বা এগুলো কষ্টসাধ্য, শুধুমাত্র এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কুরআন পাঠ পরিত্যাগ করা উচিত নয়, বরং কুরআন নিয়মিত পাঠের প্রতি প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টি থাকা চাই। হ্যাঁ, সহজভাবে মূল শব্দের যতটা নিকটতর উচ্চারণ করা যায়, তা করা উচিত। এই চেষ্টা অবশ্যই থাকা উচিত আর এক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, আমাদের প্রতিটি অক্ষর ক্বারীর মতই উচ্চারণ করতে হবে, এমন ধারণা সঠিক নয়। কেননা আমরা যারা অনারব, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই শক্তিই দেন নি। তিনি বলেন, আমার মরহুমা স্ত্রী উম্মে তাহের বলতেন, তার পিতার কুরআন পাঠ করা এবং পড়ানোর সুগভীর আগ্রহ ছিল। তিনি তার ছেলেদেরকে পড়ানোর জন্য শিক্ষক রেখেছিলেন, আর মেয়েকে পড়ানোর দায়িত্বও তার উপরই ন্যস্ত করেছিলেন। উম্মে তাহের বলেন, সেই শিক্ষক অনেক বেশি প্রহার করতেন। আমাদের দু'আঙ্গুলের মাঝে ছোট কঞ্চি রেখে (অর্থাৎ- পেন্সিল আকারের গাছের ছোট ডাল রাখতেন, আবার কোন কোন শিক্ষক পেন্সিলও রাখেন) আঙ্গুলের উপর চাপ দিতেন, মারতেন, প্রহার করতেন এ কারণে যে, আমরা কেন সঠিকভাবে উচ্চারণ করি না। আমাদের পাঞ্জাবীদের উচ্চারণ এমনই, অর্থাৎ আরবী শব্দ আমরা আরবদের মত করে উচ্চারণ করতে পারি না। (আল্ ফযল, ১১ অক্টোবর, ১৯৬১, পৃ. ২-৩, ৫০/১৫ তম খণ্ড, ২৩৫তম সংখ্যা)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেই আরবের ঘটনার উল্লেখ করেন, যার কথা আমি গত খুতবায় বলেছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সেই আরব সাক্ষাৎ করতে আসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দু'তিন বার 'দোয়াদ' শব্দ বলেন, তখন সেই ব্যক্তি বলে, আপনি কীভাবে মসীহ্ মওউদ হতে পারেন? কেননা আপনি 'দোয়াদ' শব্দও সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে জানেন না। সেই আরব এমনটি বলে খুবই অন্যায় কাজ করেছে। প্রত্যেক দেশের মানুষের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আরবরা নিজেরাই বলে, আমরা 'নাতেক্বীন বিদ্‌দাদ' অর্থাৎ 'দোয়াদ' শুধু আমরাই উচ্চারণ করতে পারি, ভারতীয়রা তা পারে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ভারতীয় মানুষ এটিকে হয়ত 'দোয়াদ' বলে থাকে বা 'যাদ'। কিন্তু এর উচ্চারণ ভিন্ন। আরবরা যেহেতু নিজেরাই বলে, আমরা 'নাতেক্বীন বিদ্‌দাদ'– অর্থাৎ আমরা ছাড়া অন্য কেউ এটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেনা, তাই আপত্তির কী আছে বা এক্ষেত্রে আপত্তির যৌক্তিকতা কোথায়? (আল্ ফযল, ১১ অক্টোবর ১৯৬১, পৃ. ৩, ৫০/১৫তম খণ্ড, ২৩৫তম সংখ্যা)

অতএব, আরব আহমদীদেরও এটি দৃষ্টিতে রাখা উচিত। সচরাচর অধিকাংশ আরব একথা বুঝে, কিন্তু স্বভাবগতভাবে কেউ কেউ অহঙ্কারীও হয়ে থাকে। এক পাকিস্তানি মহিলার একজন আরবের সাথে বিয়ে হয়েছে। তিনিও নিজের মত করে গলা থেকে শব্দ উচ্চারণ করে মনে করেন, আমি সঠিক উচ্চারণ করেছি অথচ সেই উচ্চারণও ষোলআনা সঠিক নয়। একথা যদি তার নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে কোন অসুবিধা ছিল না, আর এখানে আমার বলারও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমি জানতে পেরেছি, সেই মহিলা কোন কোন অধিবেশনে হাসিঠাট্টার ছলে বলে থাকে, পাকিস্তানিরা কোন কোন অক্ষর উচ্চারণ করতে পারে না, কুরআন

পড়তে জানে না, আরবী অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না আর আরবরাও তাদেরকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। আরবদের সবাই যে এমন হাসিঠাট্টা করে বা তিরস্কার করে, তা কিন্তু আমি মনে করি না। হতে পারে, যে আরবের সাথে তার বিয়ে হয়েছে, তারা হয়তো এমনটি করে। ইসলাম বলে, সব জাতির মন জয় করে তাদেরকে আল্লাহ্‌র কালাম বা **বাণীর সাথে শুধু পরিচিত করালেই চলবে না**, বরং তা পাঠের জন্য তাদের হৃদয়ে সেই কালাম বা গ্রন্থের প্রতি ভালোবাসাও সৃষ্টি করতে হবে। সবার উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন। কুরআনের প্রতি ভালোবাসার কারণে সবাই সর্বোত্তমভাবে তা পাঠের চেষ্টা করে, আর তাই করা উচিত। সঠিক এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণের ব্যাপারে যত্নবান অবশ্যই হওয়া উচিত আর যারা সঠিকভাবে কুরআন পড়তে জানে এবং এ বিষয়ে নবাগত মুসলমানদেরকে সাহায্য করতে পারে, তাদের তা করা উচিত। কিন্তু হাসিতামাশার অনুমতি দেয়া যেতে পারে না।

অতএব, যারা সঠিক উচ্চারণ জানে, তাদের এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত। পৃথিবীতে বিভিন্ন মানুষ বা জাতির বসতি রয়েছে। প্রত্যেক হরফ এবং প্রত্যেক অক্ষর সবাই সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর প্রেক্ষাপটে এখন আমি আরো কিছু ঘটনা উপস্থাপন করছি। **মুসলমানদের অবস্থা যে কতটা শোচনীয়, সে সম্পর্কিত** একটি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি (রা.) এক জায়গায় বলেন– গল্প প্রচলিত আছে, ভীরু এক ব্যক্তি ছিল। তার মনে কোনভাবে এই ভ্রান্তধারণা জন্মায় যে, সে খুব সাহসী। যারা উলকি আঁকে (অর্থাৎ ট্যাটু করে বা উলকিশিল্পী) একদিন সে তাদের কাছে যায়। পুরোনো যুগে রীতি ছিল, পালোয়ানরা এবং বীরপুরুষরা নিজেদের চরিত্র এবং অভ্যাস অনুসারে তাদের বাহুতে উলকি আঁকাত। (এখানে ইউরোপেও এর অনেক প্রচলন রয়েছে) যাহোক, এই ব্যক্তিও, যারা উলকি আঁকে, তাদের কাছে যায়। যে ব্যক্তি উলকি আঁকবে, সে জিজ্ঞেস করে, কিসের উলকি আঁকাতে চাও? সে বলে, আমি সিংহের উলকি আঁকাতে চাই। যখন সে সিংহের উলকি আঁকতে আরম্ভ করে আর তা আঁকার জন্য শরীরে সুঁই ফোটায়, সুঁই ঢুকানোর ফলে ব্যথাতো পাওয়ারই কথা, আসলে সেই ব্যক্তির কোন সাহসই ছিল না (অযথাই সাহসী হওয়ার ভান করত), তখন সে বলে, এটি কি করছ? উলকিশিল্পী বলে, আমি সিংহ আঁকছি। সে জিজ্ঞেস করে, সিংহের কোন অংশ আঁকছ? সে বলে, আমি লেজ আঁকছি। সেই ভীরু বলে, সিংহের লেজ যদি কেটে যায়, তবে সেটি কি সিংহ থাকে না? সে বলে, সিংহ থাকবে না কেন? তখন সে বলে, আচ্ছা লেজ বাদ দিয়ে অন্য কাজ কর। এরপর পুনরায় সুঁই ঢুকালে সে বলে, এখন কী করছ? উলকিশিল্পী বলে, এখন ডান বাহু আঁকছি। সেই ব্যক্তি বলে, লড়াই বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি সিংহের ডান বাহু কাটা পড়ে তাহলে সেটি কি আর সিংহ থাকে না? সে বলে থাকবেনা কেন। তখন সে বলে, তাহলে এ অংশও ছেড়ে দিয়ে পরের কাজ কর।

এভাবে বাম বাহুর উলকি আঁকতে গেলে সেটিও বাদ দেয় আর জিজ্ঞেস করে, এটি ছাড়া কি সিংহ থাকে না? এরপর পায়ের উলকি আঁকতে গেলেও সে একই কথা বলে। অবশেষে সেই উলকিশিল্পী হাত গুটিয়ে বসে পড়ে। ট্যাটু বা উলকি যে আঁকাতে গিয়েছিল এবং নিজেকে খুব সাহসী মনে করত সে বলে, কাজ করছ না কেন? তখন উলকিশিল্পী বলে, এখন তো আর কিছুই করার নেই, আমি কী করব? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইসলামের সাথেও আজকাল একই ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষকরে মুসলমান আলেম-উলামা এবং নেতাদের কাজই এটি। অনেক বড় বড় বুলি আওড়ালেও কাজের বেলায় তারা ঠনঠন। তারা যেসব বিষয়ে অন্যদেরকে উপদেশ দেয়, ইসলামের শিক্ষার সাথে তার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা বলে এটিও ছেড়ে দাও, সেটিও বাদ দাও আর এভাবে একের পর এক ইসলামী শিক্ষাকে তারা জলাঞ্জলি দিতে থাকে।

এ সম্পর্কে আরো একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, আমাদের নানাজান হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব বলতেন, শৈশবে আমি খুবই চঞ্চল ছিলাম। তিনি মীর দার্‌দ-এর দৌহিত্র ছিলেন এবং দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন। সেখানে অনেক আমও হয়। তিনি বলতেন, আমের মৌসুমে সকালে আমরা পিতামাতা এবং ভাইবোন সবাই মিলে আম খেতে বসতাম। যে আমটি মিষ্টি হত, আমি সেটিকে টক বলে একপাশে রেখে দিতাম আর সবার সাথে বসে বসে বাকি আম খেতাম। আম চোষার জন্য প্রথমে একবার চেক করতে হয় আর তিনি চেক করে বলতেন এটি টক অথচ সেটি আসলে মিষ্টি হত। সবার আম খাওয়া যখন শেষ হয়ে যেত, তখন আমি বলতাম, আমার পেট ভরে নি, তাই এখন আমি টক আমগুলোই খেয়ে নিচ্ছি আর এভাবে সব আম খেয়ে ফেলতাম। একদিন আমার বড় ভাই, যিনি পরে মীর দার্‌দ-এর গদ্দিনশীন বা স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তিনি বলেন, আজ আমারও পেট ভরে নি, আজকে আমিও টক আম খাব। তিনি বলেন, আমি তাকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করলেও তিনি বিরত হন নি। শেষে আম খেতে আরম্ভ করেন এবং বলেন, আম তো খুবই মিষ্টি, তুমি এমনিতেই টক টক বলছিলে। আম চোষার সময় যেভাবে তিনি মিষ্টি আম পৃথক করে রেখে দিতেন আর বাকি আমে অন্যদের সাথে ভাগ বসাতেন, পরে টক বলে রেখে দেওয়া আমগুলোও খেয়ে ফেলতেন। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বর্তমান সময়ের মুসলমানদের অবস্থাও এমনই।

যেসব লোক বলে, ইসলামী শরীয়ত এভাবে প্রবর্তন করা উচিত, তাদের অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে সেসব লোকের

অবস্থা কী হবে, যারা ইসলাম সম্বন্ধে জানেই না? ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার কথা যারা বলে, তারা এমনটিই করে। প্রতারণামূলক ভাবে নিজেদের জন্য বিভিন্ন জিনিস পৃথক করে রেখে দেয়। (এখানে আমের ক্ষেত্রে যিনি এমনটি করেছেন) তার তো শৈশব কাল ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তো জেনেশুনে ভুল কাজ করা হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যারা ইসলাম সম্পর্কে জানেই না, তারা তো হাড়-মাংস কিছুই আর বাকি রাখবে না। (আল্ ফযল, ১১ অক্টোবর ১৯৬১, পৃ. ৩, ১৫/৫০তম খণ্ড, ২৩৫তম সংখ্যা)

ইসলামের অনেক বড় একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা

সবকিছুই তারা এভাবেই সাবাড় করে ফেলবে, তা অবৈধই হোক না কেন। কাজেই বর্তমান সময়ের আলেমরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য লুটপাটের বৈধতা দেখিয়ে যে লুটপাট করছে, চতুর্দিকে আমরা তা-ই লক্ষ্য করছি। বর্তমান যুগে এই হলো ইসলামের করুন দশা। এসব আলেমের কারণে অন্যরাও ইসলামের নামে লুটপাট করছে। এসব উলামার কারণেই বিভিন্ন সংগঠন মাথাচাড়া দিয়েছে, যারা যুলুম ও অত্যাচারের বাজার গরম করে রেখেছে। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা করুণা করুন। এরপর আত্মসংশোধনের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের ঈমান কীভাবে বৃদ্ধি করা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে কীভাবে সম্পর্ক গড়া যায়, তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামা'তকে নসীহত করে বলেন, "আপনারা যদি নিজেদের মাঝে তাকওয়া এবং পবিত্রতা সৃষ্টি করেন, দোয়া এবং যিকরে ইলাহীর অভ্যাস গড়েন, তাহাজ্জুদ এবং দরূদশরীফ রীতিমত পড়েন, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আপনাদেরও সত্যস্বপ্ন ও দিব্যদর্শন থেকে অংশ দান করবেন এবং স্বীয় এলহাম ও বাণী দ্বারা সম্মানিত করবেন। আর সত্যিকার অর্থে জীবন্ত নিদর্শন সেটিই, যা মানুষের নিজ-সত্তায় প্রকাশ পায়। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নিদর্শনও নিঃসন্দেহে অনেক বড়। হযরত মূসা (আ.)-এর নিদর্শনও অনেক বড়। হযরত ঈসা (আ.)-এর নিদর্শনও অনেক বড়, কিন্তু মানুষের নিজ সত্তার যতটুকু সম্পর্ক আছে, তার জন্য সেই নিদর্শনই মহান হয়ে থাকে, যা মানুষ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করে"। [আজও মানুষ একই প্রশ্ন করে। যদি নিদর্শন দেখতে হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা আবশ্যক।]

ঈমান বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত নিদর্শনের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি (রা.) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ (রা.)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন,] "সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ সাহেবকে দেখ! আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর কিছুদিন তিনি কাদিয়ানে অবস্থান করে কাবুল ফিরে যান। তখন সেখানকার গভর্ণর তাকে ডেকে বলে, তওবা কর। তিনি বলেন, আমি কীভাবে তওবা করতে পারি? যখন কাদিয়ান থেকে যাত্রা করি তখনই আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমাকে হাতকড়া পরানো হয়েছে। অতএব, খোদা তা'লা যেখানে আমাকে বলেছিলেন, এপথে তোমাকে হাতকড়া পরতে হবে, আমি কীভাবে সেই হাতকড়া খোলানোর চেষ্টা করতে পারি? এই হাতকড়া আমার হাতেই থাকা উচিত, যেন আমার প্রভুর কথা পূর্ণতা লাভ করে। দেখ! এই আস্থা এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস তিনি অর্জন করেছিলেন একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে। অনুরূপভাবে, কোন ব্যক্তির জ্ঞান যত স্বল্পই হোক না কেন, যদি সে কোন স্বপ্ন দেখে আর ভীরুতার কারণে তা গোপন করে, তাহলে ভিন্ন কথা। নতুবা নিজের মিথ্যা স্বপ্নের উপরও এর চেয়ে তার বেশি বিশ্বাস বা আস্থা থাকে"। (আল্ ফযল, ২২ জুলাই ১৯৫৬, পৃ. ৫, ৪৫/১০তম খণ্ড, ১৬৯তম সংখ্যা)

অতএব, মানুষের ঈমান যদি দৃঢ় হয় আর আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক থাকে, তাহলে জগৎপূজারি লোকদের ভয় মানুষ করে না। আরো একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত সুফী আহমদ জান সাহেব লুধিয়ানভী অনেক বড় বুযূর্গ ছিলেন। তিনি নিজ যুগের পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একবার জম্মুর মহারাজা তাকে আমন্ত্রণ জানান যে, আপনি জম্মু এসে আমার জন্য দোয়া করুন। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, যদি দোয়া করাতে চান, তাহলে এখানে আমার কাছে আসুন। (আল্ ফযল, ২৭-৩০ মার্চ ১৯২৮, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৯, ৭৬-৭৭তম সংখ্যা)

আমি কেন আপনার কাছে যাব? অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে যদি সম্পর্ক থাকে, তাহলে মানুষ যত বড়ই হোক না কেন তাকে সে ভয় করে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বে তাঁর প্রতি মানুষের কেমন ভক্তি এবং শ্রদ্ধা ছিল আর তাঁর দাবির পর অবস্থা কীভাবে পাল্টে গেছে, এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখ! বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের খ্যাতিকে দৃষ্টিপটে রেখে আমরা বলতে পারি, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করত। এ বিষয়ে একজনের তো সাক্ষ্যও রয়েছে, যিনি তাঁর (আ.) দাবির পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন (অর্থাৎ সূফী আহমদ জান সাহেব, যার কথা আমি পূর্বেই বলেছি, যিনি বলেছিলেন, দোয়া করাতে হলে এখানে আসুন)। দাবির পূর্বেই লুধিয়ানার সূফী আহমদ জান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, (ইতোপূর্বেও আমরা বেশ কয়েকবার শুনেছি, তার একটি প্রসিদ্ধ পঙক্তি রয়েছে–

(অর্থাৎ, যুগের সকল রোগাক্রান্ত মানুষের দৃষ্টি তোমার উপর নিবদ্ধ। খোদার খাতিরে তুমি চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হও)

এটি ছিল একজন ওলী-আল্লাহ্‌র দূরদৃষ্টি। [সূফী আহমদ জান সাহেব ওলী-আল্লাহ্ ছিলেন। তার দূরদৃষ্টি ছিল, তিনি দেখেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই প্রতিশ্রুত মসীহ্। তিনি দাবি করুন বা না

করুন] কিন্তু আমরা বলতে পারি, যারা এতটা দূরদৃষ্টি রাখে না, তারাও জানত ইসলামের মুক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত। সেই অস্ত্র যখন তাঁকে দেয়া হয় (অর্থাৎ- সেই অস্ত্র, যা দিয়ে ইসলামকে জয়যুক্ত করার কথা) যার মাধ্যমে শত্রু পদদলিত হওয়া সম্ভব ছিল, সেই জীবন-সুধা তাঁকে দেয়া হয়, যার সাথে মুসলমানদের জীবন সম্পৃক্ত ছিল। তখন বড় বড় নিষ্ঠাবান মানুষ তাঁকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে আর বলে, যাকে আমরা সোনা মনে করতাম, আক্ষেপ! তা তো পিতল প্রমাণিত হল। এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ রাতারাতি কুধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে, এমনকি তিনি (আ.) যখন বয়আতের ঘোষণা দেন, তখন প্রথম দিন কেবলমাত্র ৪০জন মানুষ তাঁর হাতে বয়আত করেন। এক সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর প্রতি আন্তরিকতা রাখত আর [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] বড় বড় আলেমরা বলত এই ব্যক্তিই ইসলামের সেবা করতে পারেন আর স্বয়ং তারাই মানুষকে তাঁর কাছে পাঠাত। এমনকি মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেব লিখেছেন, বারাহীনে আহমদীয়া ছাপার পর আমি মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য পায়ে হেঁটে কাদিয়ান যাই। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী, যিনি পরে বিরোধিতায় সর্বশক্তি ব্যয় করেছেন তিনি লিখেছেন, তেরশ' বছরে ইসলামের ততটা সেবা কেউ করে নি, যতটা এ ব্যক্তি করেছে। (আল্ ফযল, ১৫ মার্চ ১৯৩৪, পৃ. ৬, ২১তম খণ্ড, ১১০তম সংখ্যা)

বর্তমান সময়েও বিভিন্ন নামধারী ইসলামিক টিভি চ্যানেল এ প্রেক্ষাপটে বড় বড় কথা বলে যে, তখন ইসলামের সেবার প্রয়োজন ছিল (তাই তিনি কাজ করেছেন)। কিন্তু পরে নাকি তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। আসলে এরা এমনই মানুষ যাদের হৃদয় অন্ধ। আল্লাহ্ তা'লা যাকে স্বর্ণ বানিয়েছেন, তাঁকে এরা পিতল মনে করে। আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্যের প্রতি না তাকিয়ে তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অমানিশায় নিমজ্জিত রয়েছে আর স্বল্পজ্ঞানী মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করছে। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে কাণ্ডজ্ঞান দিন।

লুধিয়ানার দারুল বয়আতের গুরুত্ব

১৯৩১ সনের শূরায় একবার **লুধিয়ানার দারুল বয়আতের** উল্লেখ করা হয়। তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) শূরার প্রতিনিধিদেরকে বলেন, "আমার মতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় (অর্থাৎ, লুধিয়ানার দারুল বয়আতের কথা হচ্ছে)। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশেষভাবে এর উল্লেখ করেছেন এবং লুধিয়ানাকে 'বাবে লুদ্দ' আখ্যা দিয়েছেন, যেখানে দাজ্জাল বধ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, (সে স্থান, যেখানে শত্রু ধ্বংস হবে, দাজ্জাল বধ হবে)। এমন স্থানের জন্য জামা'তে বিশেষ সচেতনতা থাকা চাই, যেখানে বয়আত নেওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাদিয়ান থেকে গিয়েছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) যখন তাঁর (আ.) কাছে বয়আত নেওয়ার অনুরোধ করেন, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এখানে বয়আত নেয়া হবে না (অর্থাৎ কাদিয়ানে বয়আত নেয়া হবে না)। পরবর্তীতে তিনি (আ.) লুধিয়ানায় বয়আত নেন। সেখানকার মরহুম পীর আহমদ জান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন, তবে তিনি ছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) দাবির পূর্বেই তাঁর প্রতি ঈমান আনার তৌফিক দিয়েছেন। (যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে)। মৃত্যুর সময় তিনি তার পুরো পরিবারকে একত্রিত করেন এবং বলেন, হযরত মির্যা সাহেব প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবি করবেন, তখন তোমরা সবাই ঈমান এনো, যার ফলে এই পুরো পরিবার বয়আত করে। পীর মঞ্জুর মোহাম্মদ সাহেব এবং পীর ইফতেখার আহমদ সাহেব তারই সন্তান। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন তার কন্যা। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] আমার ইচ্ছা হল, এই স্থানের নকশা বিশেষভাবে এঁকে প্রথম বয়আতের জায়গায় একটা পৃথক স্থান নির্বাচন করে তা চিহ্নিত করা আর সেখানে এ উপলক্ষে জলসা করা। যে ৪০ জন মানুষের কাছ থেকে এখানেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আত নিয়েছিলেন তাদের সবার নাম এ স্থানে লিপিবদ্ধ করানো হলো আমার ইচ্ছা।" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভেরাত ১৯৩১, পৃ. ১০৬-১০৭)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় লুধিয়ানার এ ঘরটি এখন জামা'তের মালিকানায় রয়েছে। এ মোতাবেক জামা'ত সেখানে কতটা কাজ করেছে, সে জায়গায় কী হচ্ছে, এ-সংক্রান্ত তথ্য এখন আমার কাছে নেই। যাহোক, পরে জানা যাবে। এ জায়গাকে স্মৃতিচিহ্নে রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মুসলেহ্ মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব

এরপর লুধিয়ানা এবং মুসলেহ্ মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর সামনে জান্নাতের আঙ্গুরের একটি গুচ্ছ আনা হয় এবং বলা হয়, এটি আবু জাহলের জন্য। এর ব্যাখ্যা হল, তার পুত্র ইকরামা জান্নাত লাভ করবে আর বাস্তবেও তদ্রুপই হয়েছে।

এরপর তিনি (রা.) পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ তা'লা আবু জাহলের পুত্রকে এমনই পুণ্যবান করেছেন যে, তিনি ধর্মের জন্য সুমহান ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এক যুদ্ধের সময় মুসলমানরা ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিল। খ্রিষ্টান তীরন্দাজরা চিহ্নিত করে করে মুসলমানদের চোখে তীর নিক্ষেপ করছিল। সাহাবীগণ (রা.) একের পর এক শাহাদাত বরণ করছিলেন। ইকরামা (রা.) বলেন, আমি এটি সহ্য করতে পারছিলাম না। (ইনি আবু জাহলের পুত্র ছিলেন) এবং তার সেনাপতিকে তিনি বলেন, আপনি আমাকে এদের উপর আক্রমণ করার অনুমতি দিন। এরপর তিনি ষাট জন বীর যোদ্ধা সাথে নিয়ে শত্রুদের প্রাণকেন্দ্রে গিয়ে আঘাত হানেন

এবং ঝাঁপিয়ে পড়েন আর এরূপ জোরালো আক্রমণ করেন যে, প্রাণ রক্ষার জন্য তাদের কমাণ্ডারকে পালাতে হয়। এরফলে শত্রুসৈন্য দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এই বীর যোদ্ধা এত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন যে, মুসলমান সেনাবাহিনী যখন সেখানে পৌঁছে ততক্ষণে তাদের সবাই হয়ত শহীদ হন অথবা গুরুতর আহত হন।

হযরত ইকরামা (রা.)ও গুরুতর আহত ছিলেন। একজন কর্মকর্তা এক গ্লাস পানি নিয়ে আহতদের কাছে আসেন। তিনি প্রথমে ইকরামা (রা.)-কে পানি দিতে চান কিন্তু তিনি দেখেন, হযরত সুহাইল বিন আমর (রা.) পানির দিকে তাকাচ্ছেন। তখন তিনি তাকে বলেন, প্রথমে সুহাইলকে পানি পান করাও এরপর আমি পান করব। আমার ভাই পিপাসার্ত অবস্থায় আমার পাশে পড়ে থাকবে আর আমি পান করব, তা আমার সহ্য হবে না। তিনি যখন সুহাইলের কাছে পানি নিয়ে যান, তখন তার পাশে হারেস বিন হিশামও আহত হয়ে পড়ে ছিলেন। তিনি বলেন, প্রথমে হারেসকে পানি পান করাও। হারেস (রা.)-এর কাছে পানি নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এরপর তিনি সুহায়ল (রা.)-এর কাছে ফিরে এসে দেখেন তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এরপর তিনি ইকরামা (রা.)-এর কাছে এসে দেখেন, তার প্রাণবায়ুও বেরিয়ে গেছে অথচ ইকরামা (রা.) ছিলেন আবু জাহলের পুত্র।

অতএব, কোন ব্যক্তি যদি দুষ্কৃতকারী, ধর্মহীন এবং মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে কে বলতে পারে যে, তার পুত্রও অবশ্যই তার মতই হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বাণীতে এমন সাক্ষ্য থাকে, যা এর সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট করে আর যাতে সাক্ষ্য থাকে না, তা মানার যোগ্যই নয়। আসল কথা হল, আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতের যে সংবাদ প্রদান করেন তা কীভাবে পূর্ণতা লাভ করে, সে বিষয়টি বুঝতে হবে। দেখুন! মহানবী (সা.) যখন সেই স্বপ্ন বা রুইয়্যা দেখেছিলেন, তখন তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে, আবু জাহল জান্নাতে যাবে আর আমি তাকে আঙ্গুরের থোকা দিব, এটি কী করে সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ ছিল, তার পুত্র ঈমান আনবে এবং ইসলামের জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রেও (অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতেও) অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীর মত অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে। এমন এক সময় এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেন, যখন কাদিয়ানের মানুষও তাঁকে চিনতো না। কাদিয়ানের বয়োবৃদ্ধরা শুনিয়েছেন যে, আমরা তাঁকে চিনতামও না। আমরা মনে করতাম, গোলাম মুর্তজা সাহেবের কেবলমাত্র একটিই সন্তান, যার নাম মির্যা গোলাম কাদের। এমন এক ব্যক্তি যিনি অচেনা ও অপরিচিত, যাকে তাঁর গ্রামের মানুষও চেনে না তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সন্তান দেবেন, সে জীবিত থাকবে আর তাঁর পুত্রদের মাঝে একজন পুত্র এমনও হবে, যে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে আর তাঁর মাধ্যমে তাঁর তবলীগ এবং প্রচার পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাবে। কে আছে, যে বানিয়ে এমন কথা বলতে পারে?

এরপর তিনি (রা.) বলেন, সেই পুত্র তিনকে চার করবে। এর একটি অর্থ হল, সে এই ভবিষ্যদ্বাণীর চতুর্থ বছরে জন্মগ্রহণ করবে। তিনি (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ১৮৮৬ সনে এবং [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] আমার জন্ম হয়েছে ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯সনে। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ লুধিয়ানায় প্রথমবার বয়আত নেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আমাদের জামা'তে এবং বাইরেও অনেক আলোচনা হয় আর সচরাচর প্রশ্ন করা হত, সেই ছেলে কে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ভবিষ্যদ্বাণীতে সেই ছেলের নাম মাহমুদও বলা হয়েছে। তাই শুভ কামনায় তিনি (আ.) আমার নাম মাহমুদও রেখেছেন আর তাঁর (প্রতিশ্রুত পুত্রের) নাম যেহেতু বশীরে সানীও (দ্বিতীয় বশীর) ছিল, তাই আমার পুরো নাম বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ রেখেছেন।

সন্তান জন্মগ্রহণ এবং জীবিত থাকার যতটুকু সম্পর্ক ছিল, সে অনুসারে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে আর এক ছেলের নাম মাহমুদ রাখার সৌভাগ্যও তাঁর (আ.) হয়েছে। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন্ পুত্রের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে, পৃথিবীবাসী তা জানার অপেক্ষায় ছিল। অতএব, এটি জানানোর উদ্দেশ্যেই আজ আমি লুধিয়ানায় এসেছি। (তিনি লুধিয়ানায় গিয়েছিলেন) তিনি (রা.) বলেন, লুধিয়ানার সাথে আহমদীয়া জামা'তের কয়েক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পর্ক রয়েছে। জামা'তের ইতিহাসের ক্ষেত্রে লুধিয়ানার গুরুত্বও বেশকিছু দিক থেকে। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রথম বয়আত নিয়েছেন এই শহরে। (প্রথম সম্পর্ক) তাঁর (বিদায়ের) পর হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) তাঁর প্রথম খলীফা হয়েছেন। তার বিয়েও লুধিয়ানায় মরহুম হযরত মুন্সী আহমদ জান সাহেবের পরিবারে হয়েছে। (এটি দ্বিতীয় সম্পর্ক) আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে যে ছেলের সম্পর্ক, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেই স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি লুধিয়ানায় বসবাস করেছেন। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] আমার মনে আছে, শৈশবে কিছুদিন আমিও এখানে থেকেছি।

তখন আমি এত ছোট ছিলাম যে, সে যুগের বিশেষ কোন কথা আমার স্মরণ নেই। কেননা আমার বয়স তখন দুই বা আড়াই বছর ছিল। [এখন দেখুন! এই বয়সের কিছু কথা তাঁর স্মৃতিতে অম্লান ছিল, যা সচরাচর স্মরণ থাকে না। তিনি (রা.) বলেন,] শুধু একটি ঘটনা আমার মনে আছে আর তা হল, আমরা যে বাড়িতে থাকতাম তা রাস্তার মাথায় ছিল আর রাস্তা ছিল সোজা। আমি ঘর থেকে বাইরে যাই, তখন ছোট্ট একটি ছেলে

অপর দিক থেকে আসছিল। সে আমার কাছে এসে একটি মৃত টিকটিকি আমার উপর ছুঁড়ে মারে। আমি এতটাই ভয় পাই যে, কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে আসি। সেই বাজারের নকশাও আমার মনে আছে। এটি সোজা একটি বাজার ছিল। এখন আমি জানি না, সেই বাজার কোন্‌টি। তখন আমাদের ঘর বাজারের এক প্রান্তে ছিল। শৈশবের বেশ কয়েক মাস আমি এখানে কাটিয়েছি। কাজেই বিভিন্ন দিক থেকে আহমদীয়াতের সাথে এই শহরের সম্পর্ক রয়েছে। (আহালিয়ানে লুধিয়ানা সে খিতাব, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২৫৭-২৫৯)

যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, **হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই শহরের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।** তিনি (রা.) বলেন, আমি ভাবছিলাম, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যেসব কথা ঘোষণা করা হয়, সেসবের বিরোধিতা মানুষ অবশ্যই করে। আর মুসলেহ্ মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ঘোষণা করা হয়েছিল। লুধিয়ানার পূর্বেই লাহোরে জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হুশিয়ারপুরেও জলসা হয়েছে, কিন্তু বিরোধিতা হয় নি। জানি না, বিরোধিতা কেউ কেন করে নি। কিন্তু যখন লুধিয়ানা আসি আর এখানে এসে আমি যখন শহর অতিক্রম করছিলাম, তখন মানুষের মিছিল এই জয়ধ্বনির সাথে অতিক্রম করছিল যে, নাউযুবিল্লাহ্ মির্যা মারা গেছে, মির্যা মারা গেছে। যাহোক, এতে আমাদের কিছু যায় আসে না। মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ভুলে যাওয়ার কারণে তারা এই হাসিঠাট্টা করে, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীও অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই দোয়াও করেন যে, লুধিয়ানাবাসীদেরকে খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক দিন আর আজ যারা বিরোধিতায় ধ্বনি উচ্চকিত করছে, আগামীকাল তারাই যেন তাঁর পক্ষে নারা উত্তোলন করে। (আহালিয়ানে লুধিয়ানা সে খিতাব, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২৬০)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর (আ.) একজন সাহাবীর একনিষ্ঠ প্রেমময় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব (রা.)ও এমনই গভীর ভালোবাসা রাখতেন। একবার তিনি কাদিয়ান আসেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে দিয়ে কোন কাজ করাচ্ছিলেন। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেবের ছুটি যখন শেষ হয়ে যায় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে তিনি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চান তখন হুযূর বলেন, আরো কিছুদিন এখানে অবস্থান করুন। ছুটির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য তিনি আবেদন পত্র পাঠিয়ে দেন কিন্তু তার অফিসের পক্ষ থেকে উত্তর আসে আর ছুটি দেয়া সম্ভব নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে তিনি এর উল্লেখ করেন। তিনি (আ.) বলেন, আরো কিছুদিন এখানে অবস্থান করুন। তিনি লিখে পাঠিয়ে দেন, এখন আমি আসতে পারব না। তখন মহকুমা অফিসের কর্তারা তাকে বরখাস্ত করে (সরকারী মহকুমা ছিল)। চার বা ছয় মাস বা যতদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে সেখানে থাকতে বলেন, তিনি সেখানে অবস্থান করেন। এরপর যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন তার অফিস এই প্রশ্নের অবতারণা করে যে, যে কর্মকর্তা তাকে বরখাস্ত করেছে, তাঁকে বরখাস্ত করার কোন অধিকারই তার ছিল না। এভাবে তিনি নিজের জায়গায় পুনরায় বহাল হন এবং যে কয়েক মাস তিনি কাদিয়ানে অতিবাহিত করেছেন, এর বেতনও পেয়েছেন।

একইভাবে, তিনি (রা.) আরো একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। কপুরথলার মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবের সাথে এই ঘটনা ঘটে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি ডালহৌসি সফর করছিলাম। রাস্তায় মিয়াঁ আতাউল্লাহ্ উকীল সাহেব আমাকে এ ঘটনা শুনিয়েছেন। [এ ঘটনা ১৯৩৪ সনে আল্ হাকামেও ছেপেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] তাই আমি মুন্সী সাহেবের নিজের ভাষায় শুনাচ্ছি। তিনি বলেন, আমি যখন সেরেশ্‌তাদার নিযুক্ত হই, তখন শুনানি বিভাগে কাজ করতাম। একবার মামলামোকদ্দমার কাজ ইত্যাদি বন্ধ করে কাদিয়ান চলে আসি।

তৃতীয় দিন যাওয়ার অনুমতি চাইলে [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,] অপেক্ষা করুন। এরপর তাঁকে অনুরোধ করা ঠিক মনে হল না। ভাবলাম, তিনি (আ.) নিজেই বলবেন। এক মাস পার হয়ে যায়। এদিকে মোকদ্দমার কাগজপত্র আমার বাসায় ছিল বিধায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে কঠোর ভাষায় পত্রাদি আসা আরম্ভ হয়। কিন্তু এখানে যে পরিস্থিতি ছিল তা হল, এসব পত্র সম্পর্কে আমি ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করতাম না। (তিনি বলেন, আমি সব ভুলে যাই। পত্র আসলে আসুক) হুযূরের সাহচর্যে এমন এক আনন্দ এবং আত্মবিস্মৃতির মাঝে ছিলাম যে, চাকরি চলে যাওয়ার বা জবাবদিহিতার কোন চিন্তাই ছিল না। অবশেষে সেখান থেকে খুবই মারাত্মক একটি পত্র আসে। আমি সেই পত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে উপস্থাপন করি। তিনি (আ.) তা পড়ে বলেন, লিখে দাও, আমাদের আসা হবে না (আমরা এখন আসতে পারব না)। আমি এই বাক্যই লিখে পাঠাই।

এরপর আরো এক মাস কেটে যায়। একদিন তিনি (আ.) বলেন, কত দিন অতিবাহিত হয়েছে? তখন মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই হিসেব করেন এবং বলেন, ঠিক আছে আপনি চলে যান। আমি কপুরথলা পৌঁছে ম্যাজিস্ট্রেট লালা হারচান্দ দাসের বাসায় এটি জানার জন্য যাই যে, (সেই ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতেই তিনি চাকরি করতেন) কী সিদ্ধান্ত হয়েছে। (চাকরিতে বহাল রাখবেন, নাকি বের করে দিয়েছেন, নাকি জরিমানা করবেন? যখন তার বাসায় গেলাম,)

তখন তিনি বলেন, মুন্সী সাহেব! মির্যা সাহেব হয়তো আপনাকে আসতে দেন নি (এ কথাই ম্যাজিস্ট্রেট বলেন)। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেন, তাঁর নির্দেশই শিরোধার্য [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর]। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মিয়াঁ আতাউল্লাহ্ সাহেবের রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত এই কথাটিও রয়েছে যে, মরহুম মুন্সী সাহেব বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বলেন, লিখে পাঠিয়ে দাও, আমরা আসতে পারব না, তখন আমি সেই বাক্যই লিখে ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠিয়ে দেই।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই একটি শ্রেণি ছিল, যারা প্রেম ও ভালোবাসার এমন মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, পূর্ববর্তী (নবীদের) জামা'তসমূহের সামনে আমাদের কোনভাবেই লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের জামা'তের বন্ধুদের মাঝে দুর্বলতা এবং ঔদাসীন্য যতই থাকুক না কেন, যদি হযরত মূসা (আ.)-এর সাহাবীরা আমাদের সামনে নিজেদের আদর্শ তুলে ধরেন, তাহলে আমরা তাদের সামনে এই জামা'তের আদর্শ তুলে ধরতে পারি। অনুরূপভাবে, হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহাবীরা যদি কিয়ামত দিবসে নিজেদের মহান কার্যাবলী তুলে ধরে, তাহলে আমরা গর্বের সাথে তাদের সামনে আমাদের এসব সাহাবীকে উপস্থাপন করতে পারি। আর মহানবী (সা.) যে বলেছেন, আমি বলতে পারি না, আমার উম্মত এবং মাহ্দীর উম্মতের মাঝে কী পার্থক্য! কাজেই, সত্যিকার অর্থে এমন লোকদের কারণেই [তিনি (সা.) এ কথা] বলেছেন।

তাঁরা এমন মানুষ ছিলেন, যারা হযরত আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) এবং আলী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীদের (রিযওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম) ন্যায় সব ধরনের কুরবানী এবং ত্যাগস্বীকার করতেন আর আল্লাহ্‌র পথে সর্বপ্রকার বিপদাপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে দেখ! যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাঁকে জামা'তে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন, তাই আমি তাঁর নাম উল্লেখ করি নি। নতুবা তার কুরবানীর ঘটনাবলীও বিস্ময়কর।

তিনি যখন কাদিয়ান আসেন, তখন ভেরায় তার প্র্যাকটিস বা চিকিৎসা ব্যবসা চলমান ছিল, চিকিৎসালয় খুলেছিলেন আর ব্যাপক পরিসরে কাজ চলছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে তিনি যখন বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চান, তখন তিনি (আ.) বলেন, গিয়ে কী হবে, এখানেই থাকুন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সামগ্রী আনার জন্যও নিজে যান নি। (নিজ আসবাবপত্র আনার জন্যও যান নি) বরং অন্য কাউকে পাঠিয়ে ভেরা থেকে তাঁর জিনিসপত্র আনিয়ে নেন। এসব কুরবানী এবং ত্যাগই বিভিন্ন জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে থাকে আর এই মর্যাদা লাভের জন্যই প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। নিছক দার্শনিকের মত ঈমান মানুষের কোন কাজে আসতে পারে না। সে ঈমানই মানুষের কাজে আসে, যাতে প্রেম এবং ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য থাকে।

দার্শনিক নিজ ভালোবাসার দাবি যতই করুক না কেন, একমাত্র যুক্তিতর্ক ছাড়া তার কোন গুরুত্বই নেই। কেননা অন্তর চক্ষুর মাধ্যমে সে সত্যকে দেখে নি, বরং শুধু যুক্তির নিরিখে দেখেছে। কিন্তু যে কেবল যুক্তির চোখে নয় বরং অন্তরের চোখে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলী এবং সত্যকে চিনে, তাকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। কেননা মনমস্তিষ্ক দর্শনের দাসত্ব করে আর হৃদয় প্রেমের অনুসরণ করে। (আল্ ফযল, ২৮ আগষ্ট ১৯৪১, পৃ. ৬-৭, ২৯তম খণ্ড, ১৯৬তম সংখ্যা)

অন্তর চক্ষুর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যুগ-ইমামকে চেনার এবং এর উপর সব সময় প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন। সর্বদা আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীকে সনাক্ত করতে পারি আর শয়তান যেন কখনো আমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে।

নামাযের পর এক ভাইয়ের গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি আমাদের এক দরবেশ ভাইয়ের জানাযা। তিনি হলেন, চৌধুরী নবাব দ্বীন সাহেবের পুত্র মৌলভী খুরশীদ আহমদ প্রভাকর সাহেব। গত ২৮ জুলাই,২০১৫ সনে ৯৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। তিনি লায়লপুরের (বর্তমানে এটি ফয়সালাবাদ নামে পরিচিত) একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মসূত্রে আহমদী ছিলেন। ১৯৩৬ সনে পনের বছর বয়সে প্রথমবার কাদিয়ান দেখতে আসেন এবং মসজিদ মোবারকের ছাদে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর একটি প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে যোগদান করেন। ফিরে যাওয়ার পুরো ভাড়া না থাকার কারণে কাদিয়ান থেকে অমৃতসর এবং সেখান থেকে লাহোর পর্যন্ত প্রায় ৯৫ কিলোমিটার দূরত্ব পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন।

১৯ বছর বয়সে তিনি ওসীয়্যত করেন। ১৯৩৭ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে তিনি লিখেন, তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণের মেয়াদ ডিসেম্বর ১৯৩৬-এ সমাপ্ত হয়েছে। আমি তখন ছাত্র ছিলাম। আমার এখন কিছু আয়-উপার্জন আছে। নিয়মের ব্যতিক্রম করে আমাকে তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হোক। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে এবং সকল আয়-উপার্জনহীন ছাত্র, যাদের আয়-উপার্জন আরম্ভ হয়েছে মাত্র, তাদেরকে এই অনুমতি প্রদান করেন। এরপর মৌলভী খুরশীদ আহমদ প্রভাকর সাহেব সিন্ধুতে জামা'তের কৃষি জমিতেও কাজ করেছেন। ১৯৪৭ সনের প্রথম দিকে তিনি জীবন উৎসর্গ করে কাদিয়ান পৌঁছেন। সে বছরই ভারত বিভক্ত হয়, যার ফলে দরবেশী জীবন অবলম্বনের সৌভাগ্য লাভ করেন। এই যুগ তিনি একান্ত ধৈর্য, বিশ্বস্ততা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। দেহাতী মুবাল্লেগ হিসেবে ভারতের উত্তর প্রদেশে তবলীগ এবং প্রচারের কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন।

তবলীগি ময়দান থেকে কাদিয়ান আসার পর তিনি তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল ও কাদিয়ানের মাদ্রাসা আহমদীয়ায় শিক্ষক হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন। নেযারত দাওয়াত ও তবলীগের অধীনে তিন বছর পর্যন্ত তিনি হিন্দী পড়েন এবং রতন, ভূষণ ও প্রভাকর, এই তিনটি হিন্দী ডিগ্রি অর্জন করেন। বেদ, বাইবেল, গীতা, গুরুগ্রন্থ সাহেব- এর উপর বেশ ভালো দখল ছিল। হিন্দু, শিখ ও খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে গবেষণামূলক রচনাবলী লিখেছেন। কুরআনের হিন্দী অনুবাদের সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৫২ সনে যখন পুনরায় বদর পত্রিকার প্রকাশনা আরম্ভ হয়, তখন থেকেই এতে তার প্রবন্ধ ছাপতে শুরু করে। আর এই ধারা ২০১৩ সন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ তার প্রবন্ধ লেখার এই ধারা প্রায় ৬০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এছাড়া জামা'তের অন্যান্য পত্রপত্রিকা, যেমন– মিশকাত, রাহে ঈমান ইত্যাদিতেও বিভিন্ন সময় তার প্রবন্ধ ছাপা হত। অন্যান্য দেশীয় পত্রপত্রিকাও তার প্রবন্ধ ছেপেছে। দৈনিক হিন্দ সমাচার, মিলাপ এবং কাশ্মীরের পত্রপত্রিকা এর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬৩ সনে নেযারত দাওয়াত ও তবলীগের অধীনে 'বর্তমান সরকার এবং আহমদী মুসলমান' নামে তার একটি পুস্তিকা ছেপেছে এবং তা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। তার বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং কবিতা খুবই উন্নত মানের হত।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও এর প্রশংসা করেছেন আর পড়লেই বুঝা যেত, তা হৃদয় থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। বড় জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ তিনি লিখতেন। কখনো কারো মুখাপেক্ষী হওয়া পছন্দ করেন নি। নিজের কাজ নিজেই করতেন। লেখাপড়ার কাজের পাশাপাশি ছেলেদেরকে সাথে নিয়ে কৃষিকাজও করতেন, গবাদি পশুও পালতেন। সম্পদশালী হয়ে সন্তানদের জন্য ব্যক্তিগত আবাসনের ব্যবস্থা করে জামা'তী ঘর আঞ্জুমানকে ফেরত দেন। এটি তিনি অনেক বড় এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। চরম অসুস্থতার দিনগুলোতেও রীতিমত মসজিদে এসে নামায পড়তেন।

তিনি সত্য স্বপ্নও দেখতেন এবং খোলাফায়ে কেরামকে তা লিখে পাঠাতেন। মৃত্যুর এক মাস পূর্বে তার ছোট ছেলে ইব্রাহীমকে মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। এক সপ্তাহ পূর্বে তাকে আবার স্মরণও করিয়েছেন। তিনি দু'টি বিয়ে করেছিলেন। ১৯৪৪ সনে শ্রদ্ধেয়া আলম বিবির সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়। সেই স্ত্রীর গর্ভে এক সন্তান রয়েছে মুনীর আহমদ, যিনি পাকিস্তানে আছেন আর দ্বিতীয় বিয়ে করেন ১৯৫৬ সনে কর্ণাটকের হাবলী নিবাসী আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের কন্যা আয়েশা বেগম সাহেবাকে, যার গর্ভে আল্লাহ্ তা'লা তাকে পাঁচ পুত্র এবং তিনজন কন্যাসন্তান দান করেছেন।

তার ছেলেদের মাঝে ইসরাঈল আহমদ, কৃষাণ আহমদ, ইব্রাহীম আহমদ এবং জামাতা শাকীল আহমদ ও মাহমুদ আহমদ সাহেব জামা'তের খিদমত করার তৌফিক পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সর্বদা খিলাফত এবং জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দিন। (আমীন)

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ আগষ্ট-০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ২২তম খণ্ড, ৩৪-৩৫তম সংখ্যা, পৃ. ৫-৯)

Newly Released

Please visit Pakkhik Ahmadi Website :

www.theahmadi.org

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit:

www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(৩২তম কিস্তি)

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন

সম্পদের বিতরণের ক্ষেত্রে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৃত ব্যক্তির সম্পদের নির্ধারিত অংশ তার ওয়ারিশদের যেমন, পিতা, মাতা, স্বামী বা স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন সবার মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। কাউকে তার প্রাপ্য ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটা তার হক্ এবং এই হক্ খোদাপ্রদত্ত, অবশ্য, কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকলে সে ভিন্ন কথা। তবে, তার বৈধতা নিরূপণ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত, কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়। কোন ব্যক্তি চাইলে তার সম্পত্তির সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ অন্য কাউকে বা কোন প্রতিষ্ঠানকে উইল করে দান করতে পারবে। (দ্রঃ সূরা নিসা, ৪ঃ৮-১৩)। এই ব্যবস্থাগুলো যথারীতি কার্যকর হলে, মাত্র স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে সম্পদ জমা হওয়ার, পঞ্জীভূত হওয়ার আর কোন সুযোগ থাকবে না।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন মোতাবেক, জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার লাভের বিধি অথবা জমিদারী বা তালুক ইত্যাদির আভিজাত্যতার বিধি, অথবা দাতার খেয়াল-খুশিমত উইল করার অবাধ ক্ষমতা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকারের সম্পত্তি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভাগ ভাগ হতে থাকে। যার ফলে, দেখা যায় যে, তিন-চার সিঁড়ির বা প্রজন্মের পরেই বড় বড় জমিদারীও ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে। এতে করে জমির ওপরে কোন একচেটিয়া মালিকানা টিকতে পারে না, এবং কোন কায়েমী স্বার্থভোগী শ্রেণীরও উদ্ভব ঘটতে পারে না।

ঘুষ নিষিদ্ধ

"এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, এবং কর্তৃপক্ষের নিকট (ঘুষ হিসেবে) পেশ করো না, যাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জেনে শুনে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে পার।" (আল্ বাকারা ২ঃ১৮৯)

এই বিষয়টা, যা কিনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, তার প্রতি আমি পরে দৃষ্টি দেব 'ব্যক্তিগত শান্তি' শীর্ষক আলোচনায়।

বাণিজ্যিক নীতিমালা

ইসলাম না পুঁজিবাদকে অস্বীকার করে, না বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে; বরং উভয় পদ্ধতির সব ভাল দিক ও দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করে।

নিম্নে বর্ণিত দৃষ্টান্তগুলো থেকে দেখা যাবে যে, চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই ইসলাম একটা সুষ্ঠু বাণিজ্যিক নীতিমালা দান করেছে, যা আধুনিক মানুষ অবশেষে, আবিষ্কার করেছে অনেক চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করার পর

১. ইসলামী বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে নিরংকুশ আস্থা এবং সত্যতা- (আল্ বাকারা- ২ঃ৮৩, ৮৪)

২. ইসলাম ওজনের ত্রুটিযুক্ত নিক্তি, বাটখারা ইত্যাদি ব্যবহার করতে এবং ওজনে কম দিতে নিষেধ করে, [আত্ তাৎফিফ-(মুতাফ্ফেফীন)-৮৩ঃ২-৪]

৩. বিক্রেতাদেরকে ত্রুটিযুক্ত বা পচা বা রদ্দী মালপত্র বিক্রী করতে নিষেধ করা হয়েছে ইসলামে। কোন বিক্রেতা তার কোন মালের ত্রুটি গোপন রেখে তা বিক্রী করতে পারবে না (মুসলিম) যদি তেমন কোন দ্রব্য সামগ্রী ক্রেতার অজান্তেই বিক্রয় করা হয়, তাহলে জানার পর ক্রেতার অধিকার থাকবে সেই ত্রুটিযুক্ত মাল ফেরৎ দেওয়ার এবং মূল্য ফেরৎ নেওয়ার (হাদীস)।

৪. কোন বিক্রেতা তার মালের দাম একেক জনের কাছে একেক রকম চাইতে পারবে না, যদিও তার এই অধিকার আছে যে, সে ক্রেতাদের যাকে খুশী যত খুশী বাটা দিতে পারবে। সে নিজে তার জিনিষ পত্রের দাম যুক্তিসঙ্গত ভাবে ধার্য করতে পারবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৫. ইসলাম অসঙ্গত বা অন্যায় প্রতিযোগিতা বারণ করে এবং সেই সকর কার্টেলকেও নিষিদ্ধ করে যেগুলো অনুরূপ অন্যান্য প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। নিলামে মাল বিক্রীর সময় মিথ্যা ডাক দিয়ে মালের দাম বাড়াতে কিংবা ছল-চাতুরী করে অতিরিক্ত দাম হেঁকে সম্ভাব্য ক্রেতাকে প্রতারিত করতে নিষেধ করে ইসলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

৬. তেমনিভাবে, ইসলাম চায় যে, কেনা-বেচা যেন খোলাখোলিভাবে হয়, সাক্ষী সাবুদের সামনে হয়, এবং ক্রেতাকে যেন ভালভাবে অবহিত করা হয় যে, সে কি কিনছে। (আল্ বাকারা ২ঃ২৮৩, ২৮৪)

সব কথার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, ইসলাম ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার ব্যবধান কমানোর পক্ষে সম্ভাব্য সকল পন্থাই অবলম্বন করে। এতদুদ্দেশ্যে ইসলামঃ

ক) অনেক ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যেমন, পূর্বেই বলা হয়েছে, মদ খাওয়া, জুয়াখেলা ইত্যাদি;

খ) সম্পদ মওজুদ করে রাখা এবং তার ওপর সুদ গ্রহণ করা নিষেধ করে;

গ) প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করে;

ঘ) সম্পদের দ্রুত সরবরাহকে উদ্বুদ্ধ করে;

ঙ) সাদাসিধে, সরল ও বিনয়ী জীনবযাত্রকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবলম্বন করার জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের প্রতি বার বার আবেদন জানায়, উপদেশ দেয়, নির্দেশ প্রদান করে; যাতে করে তা গরীবের নাগালের একেবারেই বাইরে না থাকে।

এ সমস্ত কিছুর অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে অন্যদের অনুভূতির প্রতি সমবেদনশীল করে তোলা, এবং তার ভেতরের পশু সুলভ ও বিকৃত প্রবৃত্তিগুলোকে দমন করা, নিধন করা। দম্ভ, ভণ্ডামি, বড়লোকী, উন্নাসিকতা বা হীনমান্যতা, গর্ব, অহংকার, ঔদ্ধ্যত্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থেই জেহাদ পরিচালনা করা। মানুষের মধ্যে যা কিছু শীমিত, মার্জিত ও মহৎ, তা সবকিছুকেই প্রকাশিত করা এবং অভাবে অনটনে জর্জারিত হয়ে শোচনীয় অবস্থায় কোন মতে প্রাণে বেঁচে থাকে, তখন বিলাসী ও আরাম আয়েশের জীবনযাপন করাটা একটা অপরাধ।

অবশ্য, তেমন উঁচ্চস্তরের সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা যারা মহৎ মানবিক মূল্যবোধের দিশারী, তাদের সংখ্যা খুবই কম। তবু সমাজে অন্য সবার কল্যাণের জন্য সামগ্রিকভাবে একটা চেতনা এমন একটা সম্মানজনক স্তরে পৌঁছায় যে, তাদের পক্ষে এটা আর সম্ভবই হয় না যে, তারা কেবল নিজেদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য চাহিদা ও আরাম-আয়েশ নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং সমাজের কম ভাগ্যবান ব্যক্তিদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি উদাসীন থাকে। জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আর শুধু অন্তর্মুখী থাকে না। তারা জীবনের একটা বৃহত্তর চেতনা নিয়ে তাদের চতুষ্পার্শ্বের সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে শিখে। তারা অস্বস্তি বোধ কের, যদি না তারা অন্যদের দুঃখদৈন্য লাঘবে বস্তুগতভাবে সহায়তা করতে পারে এবং যদি না তাদেরও জীবনযাত্রার মান বাড়তে পারে।

এই শ্রেণীর সমাজের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের একেবারে প্রথম দিককার এক আয়াতে, যার উল্লেখ পূর্বেও একবার এক বক্তৃতায় করা হয়েছেঃ

"এবং আমরা তাদের যে রিয্‌ক দানকরেছি তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে।" (আল্ বাকারা-২ঃ৪)

মৌলিক চাহিদা

পূর্ববর্তী 'অর্থ-সামাজিক শান্তি' আলোচনায় আমরা দেখেছি, ইসলাম কি করে গরীব ও অভাবী ব্যক্তিদেরকে দেয় ভিক্ষার ধারণা বা কন্‌সেপ্টের মধ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করেছে। জাতীয় সম্পদের মধ্যে ব্যক্তির অধিকার কতটুকু তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে যে মানদন্ড কুরআন করীম তাদেরকে দিয়েছে তা দিয়ে আমরা নিরূপণ করতে পারি, কি পরিমাণ সম্পদ-যা সাধারণ মানুষের মধ্যে সরবরাহ হতে পারতো তা-স্থানান্তরিত হয়েছে মাত্র কতিপয় পুঁজিপতির হাতেঃ

"এবং তারা, যাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্দিষ্ট হক; তাদের জন্যেও যারা (সাহায্য) চাইতে পারে, এবং তাদের জন্যেও যারা চাইতে পারে না।" (আল্ মা'আরিজ ৭০ঃ২৫, ২৬)।

এই আয়াত দু'টিতে ধনীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সম্পদের একটা অংশের ওপরে বৈধ মালিকানা আছে গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের।

আমরা কী করে এটা নির্ণয় করতে পারবো যে, সমাজে যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ হচ্ছে, গরীবদের যে হক্ বা অধিকার ছিল তা হস্তান্তরিত হয়ে গেছে মাত্র কয়েকজন ধনী ব্যক্তির হাতে?

এরজন্য মাপকাঠি হচ্ছে, নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত কতিপয় অধিকার। ইসলামের মতে, মানুষের মৌলিক চাহিদা হচ্ছে চারটি, যেগুলোকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

"নিশ্চয় এটা তোমার জন্য (বিধিবদ্ধ) করা হয়েছে যে, তুমি সেখানে ক্ষুধার্তও থাকবে না, এবং উলঙ্গও থাকবে না; এবং তুমি সেখানে তৃষ্ণার্তও থাকবে না; এবং রৌদ্রেও পুড়বে না।" (ত্বা'হা- ১১৯,১২০)

সুতরাং, ইসলাম মৌলিক চাহিদার সর্বনিম্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চার দফার একটি চার্টার বা সনদ পেশ করেছে, যেগুলোর পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রেরঃ

১. খাদ্য, ২. বস্ত্র, ৩. পানি ও ৪. আশ্রয়।

এমনকি, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশেও এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাদের কোন আশ্রয় বা বাসস্থান নেই এবং যাদেরকে ডাষ্টবিনের নোংরা আবর্জনা ঘেঁটে ঘেঁটে উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করে তার দ্বারাই ক্ষুধা নিবারণ করতে হয়। এই কুৎসিৎ দৃশ্য পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরের দুরবস্থা উৎঘাটিত করে দেয় এবং তার ভেতরের ব্যাধির উপসর্গগুলোকে বাইরে প্রকটিত করে তোলে। বস্তুবাদ তার চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বার্থপরতা এবং স্থবিরতার জন্ম দেয়, এবং অপরের দুঃখ কষ্টের প্রতি মানবিক সংবেদনশীলতাকে নিস্পৃহা ও অকেজো করে ফেলে।

অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের প্রায় দেশগুলোতে নিদারুণ দারিদ্র্যজনিত দুঃখদৈন্যের আরও

বেশী কুৎসিৎ দৃশ্যাবলী চোখে পড়ে, কিন্তু সেখানকার গোটা সমাজটাই দরিদ্র এবং দেশগুলো চলেও সেই একই পুঁজিবাদী নীতির ভিত্তিতে। কাজেই প্রশ্ন এটা নয় যে, এই দেশগুলোর অধিবাসীরা খৃষ্টান, না ইহুদী, না হিন্দু, না মুসলিম, না মুশরেক– পদ্ধতিটাই সেখানে আসলে প্রকৃতিগতভাবে পুঁজিবাদী।

বিশ্বের তথাকথিত উন্নত জাতিগুলোর মধ্যে অপরাধ দেদার ছড়িয়ে পড়ছে, পাপ প্রচুর হচ্ছে, বিশেষতঃ নির্দিষ্ট পল্লীগুলোতে, যেগুলোর অস্তিত্বই মানবতার চেহারার ওপরে কলঙ্কের দাগ স্বরূপ।

আফ্রিকার এমন অনেক এলাকা আছে এবং অন্যান্য অনেক দেশও এমন আছে, যে সকল স্থানে সমাজের অধিকাংশ মানুষ সাথে করে নেওয়ার মত এক ঘটি পানিও পায় না। আপনি যদি সারাদিনে এক বেলা পেট ভরে খেতে পান, তাহলে আপনাকে মনে করতে হবে, আপনি ভাগ্যবান। আর পানি? সে তো এক দৈনন্দিন সমস্যা। পৃথিবীতে এমন সব বহু দেশ আছে, যাদের এমন শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে যে, তারা সামান্য কষ্ট বরদাস্ত না করেও মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। তবু তো, এই দেশগুলো গরীব কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য তাদের সম্পদ ও সামর্থ্যকে কাজে লাগাবার কোন তোয়াক্কাই করে না।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের মতে, কোন এক ব্যক্তির দুঃখ-দুর্দশার জন্য কেবল সেই দেশের সমাজই দায়ী নয়; বরং যেকোন দেশের যে কোন সমাজের যে কোন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা গোটা মানজাতিরই দুঃখ-দুর্দশা– যে মানবজাতির না আছে কোন ভৌগলিক সীমানা, না কোন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা রাজনৈতিক সীমারেখা–এজন্য গোটা মানবজাতিই দায়ী এবং এজন্য সকল মানুষকেই খোদা তা'লার নিকটে জবাবদিহি হতে হবে। যখন কোথাও কোন দুর্ভিক্ষ, অপুষ্টি অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত দুখঃদুর্দশার সৃষ্টি হয়, তখন সেটাকে গোটা মানবতার সমস্যারূপেই গণ্য করতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত সমাজ ও রাষ্ট্রকে সেই দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

এটা একটা লজ্জার ব্যাপার যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এত সব উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে না। এমন একটা পদ্ধতি থাকা উচিত যদ্বারা সকল মানুষের সংগৃহীত সম্পদকে অতি দ্রুততার এবং যোগ্যতার সঙ্গে সেই সমস্ত এলাকায় পাঠানো যায়, যে সমস্ত এলাকায় খাদ্যভাব দেখা দেয়, বা দুর্ভিক্ষের দরুন মানুষের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়, অথবা অন্য কোন কারণে মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ে, আশ্রয়হীন উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে।

সরকারগুলোর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় দায়িত্ব রয়েছে। তাদের জাতীয় পর্যায়ের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের প্রতিটি সদস্যের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা, অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান করা, পানি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। তাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব হচ্ছে (এ বিষয়ে আরও বলা হবে পরে), সম্পদ সংগ্রহ অভিযানে সম্পূর্ণরূপে অংশ গ্রহণ করা, যাতেকরে ব্যাপক আকারের প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা মানব-সৃষ্ট বিপর্যয়সমূহের মোকাবেলা করা যায় এবং সেই সমস্ত দেশকে সাহায্য করা যায়, যারা নিজেরা তাদের সংকট নিরসনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে অপরাগ।

অতএব, সব কিছুকে ঠিক-ঠাক রাখতে চাইলে, এটা রাষ্ট্রেরই একটা দায়িত্ব হবে যে, সে ভিক্ষুক ও গরীবদেরকে তাদের পাওনা সেই সম্পদ ফিরিয়ে দেবে, যার প্রকৃত মালিকানা তাদেরই। সুতরাং, খাদ্য বস্ত্র, পানি ও আশ্রয়ের মৌলিক চারটিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে অন্য সব কিছুর চাইতে।

অন্যকথায়, একটি সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্রে, না থাকবে কোন ভিক্ষুক, না কোন নিঃস্ব মানুষ, যার জন্যে খাদ্য, বস্ত্র, পানি ও আশ্রয়ের কোন বন্দোবস্ত থাকবে না।

এই সব প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দিতে পারলেই, একটা রাষ্ট্রের পক্ষে তার সর্বনিম্ন দায়িত্বগুলো পালন করা হবে। কিন্তু, সামগ্রিকভাবে, সমাজকে এর চাইতে অনেক বেশী কিছু করতে হবে।

'মানুষ শুধু রুটিতে বাঁচে না' একটি গভীর জ্ঞানের প্রবাদ। এইসঙ্গে যোগ করুন বিশুদ্ধ পানীয় জল, পর্যাপ্ত বস্ত্র এবং মাথার ওপরে একটা ছাদের প্রয়োজনীয়তা। তবু, এই সব কিছু প্রয়োজনীয়তাকে একত্রে পূরণ করলেও তা জীবনকে সম্পূর্ণ করতে পারে না। মানুষ সব সময়েই জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সব কিছু ছাড়াও আরও কিছু পেতে চায়। সুতরাং, সমাজকে এমন আরও বেশী কিছু করতে হবে যাতে করে এক ঘেঁয়ামী কেটে যায়; গরীবদের জীবনে এমন কিছু জৌলুসের ব্যবস্থাও করতে হবে যেন তারাও ধনীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খানিকটা হলেও ভোগ করতে পারে।

আবার, এটাও যথেষ্ট নয় যে, সমাজের ভাগ্যবান ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের একটা অংশই শুধু দিয়ে দিবে কম ভাগ্যবানদেরকে। বরং এটাও প্রয়োজনীয় যে, তারা সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের দারিদ্রজনিত দুঃখ-কষ্টেরও ভাগীদার হবে। তাছাড়া এমন কিছু ব্যবস্থাও থাকা দরকার যাতে ধনী ও গরীব একসঙ্গে মেলামেশা করতে পারে, সমাজের উঁচু স্তরের লোকেরা স্বপ্রণোদিতভাবে সমাজের নীচু স্তরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করবে এবং ব্যক্তিগতভাবে জানবার চেষ্টা করবে যে, দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করার অর্থ আসলে কী। এ ব্যাপারে ইসলামে অনেক ধরণের ব্যবস্থা রয়েছে, ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের পক্ষে এটা সম্ভবই নয় যে, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে, কিংবা তাদের নিজ নিজ পরিবেশ বা মহলের মধ্যে আলাদা হয়ে থাকবে। আমরা, এর আগেও এই সব ব্যবস্থাদির ওপরে কিছুটা আলোকপাত করেছি।

(চলবে)

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(কিস্তি-২২)

খুলনা জামাতের উপর আক্রমনের চেষ্টা বিফল হয়ে গেল

ময়লা পোতা মোড়ে আমাদের বিরুদ্ধে জলসা হচ্ছিল। আমাদের খোদ্দামরা জলসা শুনছিলেন আর অবাক হচ্ছিলেন যে, এ কেমন জলসা! বিভিন্ন বক্তাগণ (মৌলভী সাহেবরা) পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন, একে অপরের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিচ্ছেন! কেউ কেউ আমাদের বিরুদ্ধেও বক্তব্য দিচ্ছেন।

সবশেষে সভাপতি সাহেব সভাপতির ভাষণ দিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বললেন। আমাদের খোদ্দামরা ভাবছিলেন এই বুঝি সভাপতি বলবেন, চলো! সবাই চলো! আমরা কাদিয়ানী আস্তানায় আক্রমন করে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে আসি।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শেষে সভাপতির সুর বদলে গেল, নরম হয়ে গেল। তিনি বললেন, দেখ এখানে খুব অল্প সংখ্যক কাদিয়ানী বসবাস করে। আমরা হাজার হাজার মানুষ সামান্য কজন কাদিয়ানীর উপর আক্রমন করব! আপনারা উত্তেজিত হবেন না। এরা এত অল্প, এরাতো কিছুই না। আপাতত আমরা ওদের আরো সময় দিতে চাই। যদি তারা বইপত্র বিতরণ বন্ধ করে তাহলে নিরাপদে বসবাস করতে পারে। আর যদি তারা বই বিতরণ ও তবলীগ বন্ধ না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। আজ আমরা আক্রমন করবো না।

সভাপতি সাহেব ঠিকই বলেছিলেন। আমরাতো আসলেই সংখ্যায় খুব অল্প ছিলাম। আমরা মনে করি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর দোয়া, আমাদের দেশের আহমদীদের দোয়ার ফলে তারা ওরকম করেছিলেন। মৌলভীরা পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিতে শুরু করেছিলেন যার ফলে সভাপতি সাহেব এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আমাদের বিরোধীরা আমাদের উপর আক্রমন করল না। তারা তাদের মত করে আমাদের সময় দিলেন, যেন আমরা তবলীগ বন্ধ করি। আমরা তবলীগ তো বন্ধ করতে পারি না। তবে এরপর শহরের বাইরে ও বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে তবলীগ করতে থাকলাম। শহরের মাঝে সাবধানতা সতর্কতার সাথে তবলীগ চলতে থাকল।

আপাতত কয়েকদিন বিরোধীরা চুপচাপ রইলেন। কিন্তু তারা অন্যরকম চিন্তা শুরু করেছিলেন। আমাদের ভাই জাকির হোসেন (এলান) মরহুম আমাকে বললেন, আপনি সাবধান হন। খুলনার বড় মাদ্রাসা, আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা কাদিয়ানী মৌলভীকে হত্যার পরিকল্পনা করছে। আমি মোটেই সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলাম না। কারন কেউ যদি কাউকে হত্যা করতে চায় তাহলে তাকে আটকানো সম্ভব হয় না। হ্যাঁ অবশ্যই আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারো প্রাণ হরণ করতে পারে না।

আমাদের জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে পরামর্শ দিলেন, আমি যেন একজন প্রভাবশলী রাজনৈতিক ব্যক্তি হাজী সাহেবের সাথে দেখা করি। হাজী সাহেব কোন একসময় আহমদী হতে চেয়েছিলেন। কোন কারণে আহমদী হননি। আমি দেখা করলাম। তিনি খুব খশী হয়ে আমাকে স্বাগত জানালেন। তিনি এমন ভাবে কথা বললেন যেন বহুদিনের পুরোন আহমদী। আলাপ এভাবে শুরু হল,রাবওয়া কেমন আছে, হুযুর কেমন আছেন, ইত্যাদী। শেষে আমার কথা বললাম। তিনি বললেন, আজকালকার দুষ্ট ছেলেরা (গুন্ডা-বদমাশরা) নেশা করে। টাকার বিনিময়ে অনাচার করে বেড়ায়। ওরা কথা শোনে না, টাকা চায়। আপনি কয়েকদিন আমার সাথে রিকশায় বসে বাজারে যাবেন। আমার সাথে আপনাকে যাতায়াত করতে দেখলে আশা করি তারা আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না। সুতরাং কয়েকদিন আমি তার সাথে চলাফেরা করলাম। আল্লাহ্ জানেন যে আমি

আল্লাহকে হেফাজতকারী বিশ্বাস করি। তবে যা করলাম তবলীগের সুবিধার খাতিরে করলাম।

একদিন সন্ধ্যার পর এক যুবক আমার সাথে দেখা করতেআসল। আমার সাথে আলাদা গোপনে কথা বলতে চাইল। খোদ্দামরা অমত করলেও আমি বললাম, আমিতো মসজিদের চার দেয়ালের বাইরে যাচ্ছি না। সেই যুবকের সাথে কথা বললাম। সে বলল, আপনাদের উপর অতর্কিত আক্রমন করা হবে। আপনাদের নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ পিস্তল, বন্দুক বা কিছু আছে কি না। আমি জামাত সম্পর্কে বললাম। সারা পৃথিবীতে আমাদের জামাত আল্লাহ্‌র জামাত। আল্লাহ্ সবসময় আমাদের রক্ষা করেন এবং করবেন। সে খুবই আশ্চর্য হল যে আমরা আল্লাহ্‌তে ভরসা করি, কোন পিস্তল বা বন্দুক রাখি না। সে বলল, আমরা দলগতভাবে টাকার বিনিময়ে কাজ করি। এখন আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, আপনাদের উপর যারা আক্রমন করবে তাদের নিষেধ করি। কিন্তু আপনি জানেন না, আমি নিষেধ করলে তারা আমাকে মারবে। তারা বলবে তুই টাকা খেয়েছিস।

সে বলল, সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। আমি তো তারিখ বলতে পারব না। তবে আমি নিজে আসব না। আমি কোন অযুহাত দেখিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।

আমি কাউকে কিছু বললাম না। বলে কী হবে। এভাবে কী করা যায়। টাকা দেয়া যায় না। কারন টাকা একবার দিলে বার বার দিতে হবে। একদলকে দিলে অন্য দলও আসবে। যে আমার সাথে কথা বলল সেই বা কত বড় নেতা, কী তার ক্ষমতা, কে জানে? নাকি ধোঁকা দিয়ে টাকা নেয়ার তালে ছিল! কিন্তু তার কথায় মনে হল সে আমার কথায় অভিভূত হয়েছে।

আমাদের আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টাঃ

এরপর কী হল শুনুন! পবিত্র রমযান মাসের ১৭ তারিখ, ৩ এপ্রিল ১৯৯১ শুক্রবার, তখন রাত প্রায় ১১টা বা ১১:৩০মি.। হঠাৎ চিৎকার শুনে ঘুম থেকে উঠে দৌড়ে বাইরে আসলাম। আমাদের মমতাজ মুয়ায্‌যেন সাহেবের (পরবর্তিতে শহীদ) বড় ছেলে নূরুজ্জামান চিৎকার করছিল, আগুন! আগুন!! আমার সাথে আরো দুজন ছিলেন, দৌড়ে সবাই আসলেন। দেখলাম, মাঠে টিন শেডের নিচে সাঈদ ভাইয়ের রেন্ট-এ-কারের দুইটি সাত সিটের গাড়ীর নিচে আগুন জলছে কিন্তু আগুনের জোর বাড়ছে না। গাড়ীতে বা কোন কিছুতে আগুন ছড়াচ্ছে না। তারপর চারদিকে পেট্রোলের গন্ধ পেলাম। আমাদের মসজিদটির দেয়াল ছিল কাঠের তৈরী, উপরে টিনের ছাদ। মসজিদের কাঠের বেড়া থেকেও পেট্রোলের গন্ধ আসছিল। আমার স্ত্রী আমার পেছনে দৌড়ে এসেছিলেন, তার গায়েও পেট্রোলের ছিটেফোঁটা পড়েছিল।

মসজিদের দেয়ালের বাইরে মুয়ায্‌যেন মমতাজ সাহেবের বাড়ী। গোল পাতার ঘর। মমতাজ সাহেবের স্ত্রীও দৌড়ে এসেছিলেন তার ছেলের আগুন আগুন চিৎকার শুনে। গাড়ীর নিচে কাপড়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগানো হয়েছিল। আগুন আস্তে আস্তে জ্বলছিল, তেজ হচ্ছিল না।

মমতাজ সাহেবের স্ত্রীর হঠাৎ তার বাড়ীর দিকে খেয়াল গেলে তিনি দৌড়ে বাড়ীর দিকে গিয়ে দেখেন দুজন মানুষ তার ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাচ জ্বালিয়ে আগুন লাগানোর চেষ্টা করছে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন,'কেরে ওখানে?' দুষ্টের দল তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। যাবার সময় ভয় দেখিয়ে গেল যে,আবার আসব। তখন দেখা যাবে কে বাঁচায়।

অগ্নি সংযোগের ঘটনাটি কেমন ছিল

গাড়ীর ড্রাইভারেরা এসে গাড়ী চালিয়ে দেখলেন। গাড়ী চলছিল। গাড়ীর নিচের কিছু প্লাস্টিকের অংশ জ্বলেছিল। গাড়ীর মালিক গাড়ী দুটোকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলেন। জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী শামসুর রহমান সাহেব পুলিশে ফোন করলে পুলিশ এসে দেখলেন তেমন কিছু হয়নি। তারা আশ্চর্য হলেন যে আগুন লাগানো হয়েছে, আগুন জ্বলেছেও কিন্তু আগুন ছড়িয়ে পড়েনি এ কেমন কথা? তখন গভীর রাত।

আমরা পরবর্তীতে ভালভাবে দেখার পর যা বুঝলাম তা এই যে–

১. ওরা আগুন লাগানোর সাথে সাথে নুরুজ্জামানের চিৎকার শুনে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেছে। সময় পেলে হয়ত ভাল করে আগুন লাগাতে পারত।

২. গাড়ি দুটোর বডিতে পেট্রোল ছিটানো হয়েছিল, গাড়ির নিচে কাপড়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগানো হয়েছিল। গাড়ীর নিচে গ্লাসে করে পেট্রোল ছিটানো হয়েছিল। কিন্তু আগুন তাড়াতাড়ি জ্বলে ছড়িয়ে পড়ল না কেন? পুরো গাড়ীতে আগুন লাগলে অনেক জোরে শব্দ হত। গাড়ীর কাছে যাওয়া যেত না । গাড়ীর পাশে পেট্রোল মাখা গ্লাস ও পেট্রোলের পাত্র পড়েছিল।

৩. এদিকে মসজিদের কাঠের বেড়াতে আগুন লাগলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হত। পুরনো শুকনো কাঠ খুব দ্রুত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত। টিনের চালে আগুন লেগে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হত। কিন্তু দুষ্কৃতকারীরা এত সময় পায়নি। পেট্রোল ছিটানো হয়েছিল কিন্তু আগুন লাগাতে পারেনি। আমাদের মসজিদ এলাকার চারদিকে পাকা দেয়াল ছিল। লোহার গেটে বড় বড় তালা লাগানো ছিল।

আমরা জেগে ওঠার কারনে যারা আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছিল তারা পালাতে বাধ্য হয়েছিল। নয়ত বাউন্ডারী ওয়ালের কারনে ধরা পড়ে যেত, পালাতে পারত না। সারা রাত আমরা জেগে জেগে পাহারা দিতে থাকলাম। তারা পালানোর

সময় বলে গিয়েছিল যে, আবার আসবে।

গাড়ীর নিচে কাপড়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগানো হয়েছিল। কিন্তু আগুন তাড়াতাড়ি জ্বলে উঠল না, ছড়িয়ে পড়ল না কেন? মোয়াজ্জেন সাহেবের গোল পাতার ঘরে আগুন লাগাতে চেষ্টা করল তারা, তাড়াতাড়ি ম্যাচ জ্বলল না। এ কেমন কথা?

আমরা জানি আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) এর প্রতি এলহাম হয়েছিল:

"আগসে হামে মাত ডারাও, আগ হামারি গোলাম বালকে গোলামোকে গোলাম।"(রুহানী খাযায়েন, খন্ড:২২; পৃ:৫৮৪)

"আমাদের আগুনের ভয় দেখিও না, আগুন তো আমাদের দাস, বরং আমদের অনুসারীদেরও দাস।" এ জন্য আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া আগুন জ্বলবে কেন?

এতক্ষন রাতের কথা বললাম এখন সকালের কথা শুনুন। সকালে শামসুর রহমান সাহেব দেখলেন, তাদের উঠানে দুটো ককটেল পড়ে আছে। তারপর খুঁজে দেখলেন মসজিদের উঠানেও বিভিন্ন স্থানে ককটেল পড়ে আছে। ফাটে নি। আল্লাহু আকবার! রাতে ককটেলগুলো ফাটেনি। নরম মাটি হয়ত ভিজা ছিল এবং অনেক ঘাসও ছিল। এগুলো ফাটলে আমাদের অনেক কষ্ট হত।

আগুন ছড়িয়ে না পড়া একটি অনেক বড় নিদর্শন যা আল্লাহ আমাদের দেখালেন। আমরা নিজ চোখে দেখলাম। বিরোধীরা অনেক হতাশ হয়েছিল। প্রমাণ লক্ষ্য করুন। আমাদের জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব এস, এম আব্দুল আযীয সাহেব খুলনা শহরে থাকতেন। তার স্ত্রী তাসলিমা সাহেবা তার মেয়েকে প্রতিদিন স্কুলে নিয়ে যেতেন। প্রতিদিনের মত সেদিন অর্থাৎ শুক্রবার রাতে আগুন দেয়া হল, শনিবার সকালে তাসলিমা সাহেবা তার মেয়েকে স্কুলে নিয়ে গেছেন। অন্যান্য মায়েরাও তাদের মেয়েদের স্কুলে নিয়ে গেছে। তাসলিমা সাহেবা অন্য মেয়েদের কথাবার্তা শুনে শুনে মনে মনে হাসছিলেন। কয়েকজন মহিলা বলাবলি করছিল যে গত রাতে কাদিয়ানীদের আস্তানা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এথেকে বোঝা যায় যে, শত্রুরা পরিকল্পিত ভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তারা ধরেই নিয়েছে যে সব জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। আমার মনে পড়লে ভাল লাগে যে, আগুন লাগানো হয়েছিল ১৭ই রমযানুল মোবারক; বদরের যুদ্ধও হয়েছিল ১৭ই রমযান।

"সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলে মুহাম্মদ।"

অনুবাদ: আল্লাহ মহাপবিত্র, সমস্ত প্রশংসার অধীকারী, মহা গৌরবের অধীকারী, হে আল্লাহ! তুমি মোহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি সীমাহীন রহমত, অনুগ্রহ বর্ষন কর।

বিকেল বেলা অনেক মানুষ এসেছিল দেখতে যে, কাদিয়ানীদের মসজিদ জ্বলে পুড়ে গিয়েছে কিনা। তারা দেখে দেখে অবাক হচ্ছিল যে, কই! কিছুই তো হয়নি।দুঃখের বিষয় মানুষ এত কিছু দেখেও সত্যকে গ্রহণ করে না।

আমাদের মসজিদের সীমানা প্রাচীরের উপর কাঁটাতারের বেষ্টনী লাগানো হল। মোহতরম মোহাম্মদ মুস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর সাহেব আমাদের প্রস্তাব অনুমোদন করে শীঘ্রই বাউন্ডারি ওয়ালের উপর কাঁটাতারের বেষ্টনী দেয়ার নির্দেশ দিলেন যেন সহজে কেউ দেয়ালের উপর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে।

আমরা আবার আল্লাহ্ তা'লার একটি নিদর্শন দেখলাম

পাকা দেয়ালের উপর প্রথমে গর্ত করে সিমেন্ট দিয়ে লোহার আংটা বসাতে হয়। সিমেন্ট জমে শক্ত হতে দুদিন সময় দিতে হয়। আমাদের বিরোধীরা আমাদের প্রস্তুতি দেখেই বুঝে গেল যে আমরা কাঁটাতারের বেড়া দিতে যাচ্ছি। পূর্বের মত দেয়াল টপকে তাদের প্রবেশ করার পথ এখন বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং তারাও পরিকল্পনা করল যে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার আগেই আক্রমণ করতে হবে। গতবার আগুন জ্বলেনি– এবার অবশ্যই আগুন জ্বালাতে হবে। অথবা অন্য কিছু।

আমাদের আশে পাশে কিছু গরীব মানুষ বাস করত, তারা আমাদের খবর দিল যে, সামনের রাতেই আক্রমণ করবে। আমরা হেডকোয়ার্টারকে জানালাম। পুলিশকে জানালাম। পুলিশ অফিসার বললেন, আপনারা খামোখা আমাদের অস্থির করেন। আমরা এসে তো কিছু পাইনা। সেদিন ফোন করলেন যে আগুন লাগানো হয়েছে। আমরা এসে দেখলাম কিছুই হয় নি।

এবার আমরা আহমদীরা দেখলাম যে এখন দোয়া করা ছাড়া আর কোন কিছু করার সুযোগ নেই। বাইরে থেকে খোদ্দাম ডেকে আনার সময়ও নেই। অতএব আমরা দোয়া করতে থাকলাম। খোদার নিদর্শন দেখুন! এটি আপনাদের গল্প মনে হবে। আমার এই লেখার সময়ও জোরে কান্না আসছে। কত অসহায় ছিলাম! আমরা নিজ খোদার সাহায্য আসমান থেকে নাযেল হতে দেখলাম।

রাতে এশার নামাযের পর পরই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। ভোর পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হতে থাকল। এত জোরে বৃষ্টি কেউ কখনও দেখেনি। আমাদের মসজিদের আশে পাশের সমস্ত অঞ্চল পানিতে ডুবে গেল। সকালে রোদ উঠল। কাঁটাতার লাগাতে মিস্ত্রিরা এসে গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত সীমানা প্রাচীরে তার লেগে গেল। আলহামদুলিল্লাহ।

(চলবে)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর ৮৬)

বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার বন্ধের জন্য আহ্বান (১১)

দাবীকারকের সত্যতার সমর্থনে প্রকাশিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার সাক্ষ্য-প্রমাণ:

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেগুলো একটার পর একটা পূর্ণ হয়েছে এবং কোন কোনটি ভবিষ্যতে পুর্ণতা লাভ করবে। পূর্বে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার তালিকা থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু ঘটনাবলী নিচে উল্লেখ করা হলো। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন: "এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে আমার জন্য নিদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহারা আমার নিদর্শনাবলীর সাক্ষী নহে।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ২৫১)।

(১) ভারতবর্ষে প্লেগের নিদর্শন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা:

'পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন...'

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দাবীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে ভয়াবহ প্লেগের আক্রমণ এমন একটি ঐশী নিদর্শন ছিল যার সম্বন্ধ তিনি বহু পূর্বেই ঐশী নির্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

(ক) ১৮৯৭ সনে 'সিরাজে মুনীর' নামক পুস্তকে প্লেগ রোগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন: "হে জগতের মসীহ তুমি জগদ্বাসীর উপর অবতীর্ণ সংক্রামক ব্যাধি হতে মুক্তিদানের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো।" (আরবী ইলহামের অনুবাদ)।

(খ) ১৮৯৮ সনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করেন: "আজ ৬ই ফেব্রুয়ারি (১৮৯৮ সন) আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, আল্লাহ্ তা'লার ফেরশতাগণ পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় কালো রঙ্গের এমন কিছু গাছের চারা রোপণ করছেন যা দেখতে কুৎসিত কালো ও বিভীষিকাময় এবং ছোট আকারের ছিল। আমি তখন ঐ চারা রোপণকারীদের প্রশ্ন করলাম, এটা কিসের গাছ? তখন ঐ ফেরেসতাগণ আমাকে উত্তরে বললেন যে, এটা 'প্লেগের বৃক্ষ'। অচিরেই পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে যার প্রাদুর্ভাব হবে এবং আমাকে এটাও জানান হল যে, আগামী শীতকালেই এই রোগের বিস্তার ঘটবে এবং এটা মারাত্মক আকার ধারণ করবে।" ...(ইশতেহার, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৮ সন)।

(গ) প্লেগ সম্পর্কে আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন যে, তাঁর বাসস্থান কাদিয়ানকে প্লেগের মারাত্মক আক্রমণ হতে আল্লাহতা'লা রক্ষা করবেন। 'কিশতিয়ে নূহ' নামক পুস্তকে (১৯০২ সনে প্রকাশিত) তিনি আল্লাহ্ তা'লা থেকে প্রাপ্ত ইলহাম অনুযায়ী ঘোষণা করেন: 'ইন্নি উহাফেজু কুল্লা মান ফিদ্দার" অর্থাৎ তোমার বাড়ীর এই প্রাচীরের ভিতর যারা অবস্থান করবে তাদেরকে আমি বিশেষভাবে রক্ষা করবো।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কিভাবে পূর্ণ হয়েছে:

ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারের পর ভারতবর্ষে বিশেষভাবে পাঞ্জাবে মারাত্মকভাবে প্লেগ দেখা দিল এবং কয়েক বছরের মধ্যে কয়েক লক্ষ লোক মারা গেল। অনেক কট্টর বিরুদ্ধবাদীরাও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হাজার হাজার লোক এই ঐশী নিদর্শনের সত্যতা উপলব্ধি করে বয়াত গ্রহণ করে এবং প্লেগের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায়। হযরত মীর্যা সাহেব ঘোষণা করেছিলেন যে টিকা নেয়ার প্রয়োজন নেই। একটি ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "একবার প্লেগের ব্যাপকতার দিনগুলিতে যখন কাদিয়ানেও প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল তখন মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব, এম, এ, ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাহার বদ্ধমূল ধারণা হইয়া গেল যে, ইহা প্লেগ। তিনি মৃত্যুপথ যাত্রীর ন্যায় ওসীয়্যত করেন এবং মুফতী মোহাম্মদ সাদেককে সব কিছু বুঝাইয়া দেন। তিনি আমার গৃহের এক অংশে থাকিতেন, যে গৃহ সম্পর্কে খোদা তা'লার ইলহাম এই যে, "ইন্নি উহাফেজু কুল্লা মান ফিদ-দার" (অর্থাৎ, "এই গৃহে বসবাসকারীদিগকে আমি রক্ষা করিব" অনুবাদক)। তখন আমি তাহাকে দেখার জন্য গেলাম। তাহাকে অস্থির ও ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, যদি আপনার প্লেগ হইয়া থাকে তবে আমি মিথ্যাবাদী এবং আমার ইলহামের

দাবী ভুল। ইহা বলিয়া আমি তাহার নাড়িতে হাত রাখিলাম। সর্বশক্তিমান খোদার এই অদ্ভুত নমুনা দেখিলাম যে, হাত রাখার সাথে সাথে তাহার শরীর এত ঠান্ডা দেখিলাম যে, জ্বরের চিহ্ন মাত্রও ছিল না।" (হাকিকাতুল ওহী, পৃ. ২১২)।

(ঘ) বর্তমান যুগের প্লেগরূপী 'AIDS' নামক রোগের ভয়াবহতা:

প্লেগ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আরো একটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান সময়ের জন্যও প্রযোজ্য। হযরত আহমদ (আ.) ১৯০৭ সনে ঐশী নির্দেশে ঘোষণা করেন যে, 'তাউন' বা প্লেগ রোগটির প্রকোপ কেবল যে শুধু ভারত উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয় বরং এই মারাত্মক রোগটি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানেও প্রসার লাভ করবে। তিনি ইলহামের মাধ্যমে খবর পেয়ে বলেনঃ "ইউরোপ ও খৃষ্টান দেশসমূহে এরূপ এক প্রকারের প্লেগ রোগ বিস্তার লাভ করবে যা বড়ই মারাত্মক আকার ধারণ করবে।" (অনুবাদ) (তাযকেরা, ৭০৫)।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ ইউরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশদ্বয়ে এবং বিভিন্ন দেশে 'AIDS' (এইডস) রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে, বর্তমান যুগের এই 'AIDS' রোগটিকে এই শতাব্দীর নতুন "তাউন" বা "প্লেগ" বলে আখ্যায়িত করা যায়।

ইসলামী পর্দা ব্যবস্থাই 'AIDS' থেকে বাঁচার সর্ব-প্রধান রক্ষা-কবচ:

উল্লেখ্য যে, 'AIDS'-এর প্রধান কারণ হলো নৈতিক চরিত্রের স্খলন এবং অবাধ মেলামেশা। এ সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর 'ইসলামী নীতি-দর্শন' নামক পুস্তকে কাম-সংযম বা সতীত্ব রক্ষার পাঁচটি উপায় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আলোকে বর্ণনা করত বলেন:

* "বিশেষভাবে একটি তত্ত্ব স্মরণ রাখিতে হইবে এবং তাহা এই যে, মানুষের স্বভাবজ অবস্থা যাহা কাম-প্রবৃত্তির উৎস, তাহা হইতে মানুষ পরিপূর্ণ পরিবর্তন ছাড়া মুক্ত হইতে পারে না। বরং মহাবিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। সেই কারণেই খোদা তা'লা আমাদিগকে পবিত্র মনোভাব লইয়া না-মাহরাম স্ত্রীলোকদিগকে অবাধে দর্শন করার, তাহাদের শোভা ও সৌন্দর্য সব দেখিয়া এবং তাহাদের নাচ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিবারও অনুমতি দেন নাই। বরং আমাদিগকে তাগিদ করা হইয়াছে যে, আমরা যেন না-মাহরাম স্ত্রীলোককে এবং তাহার শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গগুলিকে কখনও না দেখি, পবিত্র বা অপবিত্র কোন দৃষ্টিতেই নহে। তাহাদের সুকণ্ঠ, তাহাদের সৌন্দর্যের গল্প যেন আমরা না শুনি, পবিত্র ভাব দ্বারাও নহে। বরং আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন উহা শোনা ও দেখাকে মৃত্যুসম ভয় ও ঘৃণা করি, যাহাতে আমাদের পদলস্খলন না ঘটে। কারণ অবাধ দৃষ্টির ফলে যে কোন সময় পদস্খলন হইতে পারে। সুতরাং, যেহেতু খোদাতা'লা চাহেন যে, আমাদের চক্ষু, হৃদয় এবং আমাদের মনোভাব সবই যেন পবিত্র থাকে, সেইজন্য তিনি এই উচ্চ পর্যায়ের প্রতিরোধকারী শিক্ষা দান করিয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ আছে কি যে, অবাধ মেলামেশায় পদস্খলন ঘটে? যদি আমরা কোন ক্ষুধার্ত কুকুরের সম্মুখে নরম নরম রুটি রাখিয়া আশা করি যে, কুকুরের প্রাণে এই রুটির কোন খেয়াল জন্মিবে না, তবে আমরা আমাদের এই ধারণা পোষণে ভুল করিব। সুতরাং খোদাতা'লা চাহিয়াছেন, কুপ্রবৃত্তি যেন গোপন কার্যের সুযোগ না পায় এবং এমন কোনই লগ্ন বা ক্ষেত্র যেন উপস্থিত না হয়, যাহাতে কুৎসিত আশঙ্কা মাথা চাড়া দিয়া উঠে। **ইসলামী পর্দার ইহাই দার্শনিক তত্ত্ব এবং ইহাই শরীয়তের ব্যবস্থা। খোদার পবিত্র গ্রন্থে পর্দার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, স্ত্রীলোকদিগকে কয়েদীর ন্যায় নজরবন্দী অবস্থায় রাখা। এইরূপ ধারণা সেই সকল অজ্ঞ লোকেরা রাখে যাহারা ইসলামী ব্যবস্থার কোন খবর রাখে না।** বরং পর্দার উদ্দেশ্য হইল স্ত্রী পুরুষ উভয়ে পরস্পরকে অবাধ দর্শন হইতে ও পরস্পরের শোভা-সৌন্দর্যের আকর্ষণ হইতে বিরত থাকা। কারণ ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই মঙ্গল। পরিশেষে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চোখ অবনত রাখিয়া অসঙ্গত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হইতে আত্মরক্ষা করার এবং সমগ্রভাবে দর্শনযোগ্য জিনিষ দেখার যে পন্থা, উহাকে আরবী ভাষায় 'গাযযেবসার' বলা হয়। প্রত্যেক সাধু ব্যক্তি, যিনি নিজের হৃদয় পবিত্র রাখিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে মানবেতর জন্তুদের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা অবাধে চাহিয়া দেখা উচিত নহে। বরং তাহার পক্ষে সামাজিক জীবনে 'গাযযেবসর'-এর অভ্যাস অত্যাবশ্যক। ইহা সেই শুভ এবং আশিসপূর্ণ অভ্যাস যাহার ফলে তাহার এই স্বভাবজ অবস্থা এক মহান নৈতিক গুণরূপে রূপায়িত হইবে, অথচ তাহার সামাজিক কাজকর্ম সম্পাদনে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না।" (ইসলামী নীতি-দর্শন, পৃ. ৪৯)

* তিনি বলেন, "এটা এমন বিপদসঙ্কুল এক যুগ যে, যদি অন্য কোন যুগে পর্দা-প্রথা নাও বা থেকে থাকে তথাপি এ যুগে অবশ্যই তা থাকা উচিত। কেননা, এটা 'কালো যুগ' এবং পৃথিবীতে দুর্নীতি, অবাধ্যতা, অশ্লীলতা ও মদ্যপানের প্রকোপ প্রচন্ড রূপ ধারণ করেছে। মানব হৃদয়ে নাস্তিকতার ধ্যাণ-ধারণা প্রসার লাভ করছে এবং অন্তরে খোদার আদেশসমূহের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রায় লুপ্ত। মুখে সব কিছু বলা হয় এবং বক্তৃতাগুলিও যুক্তি আর দর্শনপূর্ণ, কিন্তু হৃদয় আধ্যাত্মিকতা বিবর্জিত। এমতাবস্থায় নিজেদের অসহায় ছাগলগুলোকে নেকড়ে বাঘের জঙ্গলে ছেড়ে দেয়াটা কি সমীচীন হবে?" (লেকচার লাহোর পৃ. ৩৮)।

* "দুনিয়া মেঁ এক নযীর আয়া পর দুনিয়া নে উসে কবুল না কিয়া, মগর খুদা উসে কবুল করেগা আওর বড়ে জোর আওর হামলোঁ ছে উসকি সাচ্চায়ী যাহের কর দেগা।" অর্থ: পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি। কিন্তু খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণ সমূহ দ্বারা তাঁর সত্যতা জগতে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" (ইলহাম) (হাকীকাতুল ওহী পৃ. ৬৮)।

(২) ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের শোচনীয় পরাজয় বরণ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী: কিছু বাস্তব ঘটনা–

ভারতবর্ষে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের ইসলাম বিদ্বেষী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে আহমদীয়া জামাতের আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ঐশী সাহায্য এবং সমর্থনের মাধ্যমে বিজয়ী জেনারেলের মত ভূমিকা রেখেছেন। যার ফলে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান প্রচারকগণ সর্বত্র অদ্যাবধি আহমদীয়া প্রচারকদের মোকাবেলা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে যাচ্ছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি ঘটনার সারাংশ নিচে উল্লেখ করা হলো।

(ক) পাদ্রী আবদুল্লাহ আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তার শোচনীয় পরিণতি:

আবদুল্লাহ আথম ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। একজন পদস্থ রাজ-কর্মচারী এবং পরে খৃষ্টান পাদ্রী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ আথম এবং হযরত মির্যা সাহেব (আ.)-এর মধ্যে পাঞ্জাবের অমৃতসরে ১৫ দিন ব্যাপী একটি বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল (২২ শে মে হতে ৫ই জুন ১৮৯৩ইং)। সেই সময় খৃষ্টান প্রচারকগণ ইসলামের উপর বর্ণনাতীত আক্রমণ পরিচালনা করেছিল। সমকালীণ ইসলাম-বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম পুরোধা ছিলেন এই পাদ্রী আবদুল্লাহ আথম। মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে জঘন্য ভাষায় গালি-গালাজ করতো পাদ্রী আথম। বিতর্ক সভাটিতে খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বিতর্কের সময় মোযেজা-সংক্রান্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। জীবন্ত ধর্ম ইসলামের স্বপক্ষে আল্লাহতা'লা এই বিতর্ক সভার শেষ দিনে হযরত মির্যা সাহবকে ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে পাদ্রীর শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি ঘোষণা করেন: "আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এ মোনাযেরার মধ্যে উভয়পক্ষের যে পক্ষ জেনে শুনে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে ও সত্য খোদাকে পরিত্যাগ করেছে এবং অসহায় মানুষকে খোদা বানিয়েছে, এই বহসের ১৫ দিনের প্রত্যেকটি দিনকে একমাস হিসেবে ধরে নিলে ১৫ মাসের মধ্যেই তাদেরকে হাবিয়া দোযখে নিপতিত হতে হবে, এবং সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে যদি সে সত্যের দিকে ফিরে না আসে।" (জঙ্গে মোকাদ্দাস: ১৮৯৩ সন)

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী শুনার পর পাদ্রী আথম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর মনে যীশুর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হতে থাকে এবং সে গালি-গালাজ বন্ধ করে। ফলে ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় শর্তানুযায়ী ১৫ মাসের মধ্যে পাদ্রী আথম মৃত্যু থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু আথম সাহেব শপথ-পূর্বক তার মনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানাতে অস্বীকৃতি জানাতে লাগলো যার জন্য সমালোচকরা বলতে শুরু করলো যে, ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। তখন হযরত মির্যা সাহেব ঘোষনা দিলেন: "যদি আথম ভীত না হওয়া সম্পর্কে শপথ না করে, তবুও আল্লাহ্ তা'লা তাকে ছেড়ে দিবেন না– কেননা সে সত্যকে লুকানোর মাধ্যমে পৃথিবীকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করছে।" এমন কি পর পর চারবার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বড়ো অঙ্কের অর্থ পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার সত্ত্বেও আথম সাহেব নীরবতার পথ বেছে নিলেন। অতঃপর ১৮৯৫ সনের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে একটি সর্বশেষ ইস্তেহার মারফত হযরত মির্যা সাহেব ঘোষণা করলেন যার সারমর্ম ছিল, "আথম যেন কসম খেয়ে বলেন যে মীর্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমি ভীত হইনি। এই কসম খাওয়ার তারিখ হতে এক বছর কাল পর্যন্ত যদি তিনি জীবিত থাকেন তাহলে আমাকে (মীর্যা সাহেবকে) যে–কোন শাস্তি দেওয়া হবে তা-ই আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি...।" (ইস্তেহার ৩০/১২/১৮৯৫)

অতঃপর পরবর্তী ৭ মাসের মধ্যেই ২৭/০৭/১৮৯৬ তারিখে পাদ্রী ডেপুটি আব্দুল্লাহ আথম মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে ইসলামের মহা বিজয়ের স্বাক্ষর রেখে যান। এইভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন আরো একবার বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। (বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর লেখা 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' এবং 'আঞ্জামে আথম' পুস্তক দ্রষ্টব্য)। 'আঞ্জামে আথম' পুস্তকের মাধ্যমে তিনি খৃষ্টানদেরকে তাঁর সংগে মোহাবেলা (প্রার্থনা যুদ্ধ) এবং ঐশীনিদর্শনমূলক পদ্ধতির জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে সাহস পায় নাই।

(খ) পাদ্রী হেনরী মার্টিন ক্লার্কের মিথ্যা মোকদ্দমা:

পাদ্রী আব্দুল্লাহ আথম-সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং হযরত মির্যা সাহেব কর্তৃক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে তৎকালীন উপমহাদেশীয় বড় বড় পাদ্রী সাহেবান একত্রিত হয়ে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। এই সময় হযরত মির্যা সাহেবকে আল্লাহতা'লা জানালেন যে, "সরকারের পক্ষ হতে তোমার সম্পর্কে ভীতি-জনক ব্যাপার ঘটবে, এর পরিণামে তুমিই বিজয়ী হবে।"

অমৃতসরের খৃষ্টান পাদ্রী মার্টিন ক্লার্ক ১৮৯৭ সনে ১লা আগষ্ট অমৃতসরের জিলা কোর্টে হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মার্টিন সাহেবকে খুন করানোর জন্য জনৈক নব-দীক্ষিত খৃষ্টান আবদুল হামীদকে বাদী সাজিয়ে একটি কেস দায়ের করে। গুরুদাসপুর জিলা আদালত কেসটি পেশ করা হলে সেখানকার ডি-সি, ক্যাপ্টেন এম, ডব্লিউ, ডগলাস সাহেব মোকদ্দমাটি পরীক্ষা করে হযরত মির্যা সাহেবের নামে কোর্টে হাযির হওয়ার জন্য সাধারণ সমন জারী করেন। শত্রু পক্ষ ভেবেছিল যে, এইভাবে হযরত সাহেবকে খুনের কেসে হাতকড়া অবস্থায় অপদস্থ হতে হবে। কিন্তু কয়েকমাস ধরে কেস চলাকালে আদালত কক্ষে হযরত মির্যা সাহেবকে হাতকড়া তো দুরের কথা, বরং যথার্থভাবে সম্মানের সাথে আসন দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে বিরুদ্ধবাদীদেরকে (যাদের মধ্যে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব বাটালবী অন্যতম) বসার জন্য চেয়ার দেওয়া হয় নাই। এই ঘটনার দিকে উক্ত বাটালবী সাহেব আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁকে চেয়ার তো দেওয়াই হয় নাই বরং তাকে উল্টা কথাই শুনতে হয়েছে। এই কেসে বাটালবী সাহেব কোর্টে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিলেন হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে। এই কেসে বিরুদ্ধবাদী মৌলবীগণ এবং আর্য-সমাজী পন্ডিতগণ খৃষ্টানদের সমর্থন দিতে কার্পণ্য

করে নাই। কিন্তু আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগহে কোর্টে শুনানী চলাকালে বাদী আব্দুল হামিদ আসল কথা ফাঁস করতঃ স্বীকারুক্তি দিল যে, সে পুরস্কারের লোভে এবং শাস্তির ভয়ে মার্টিন ক্লার্ক এবং তাঁর সমর্থকদের চাপে হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করেছে। ফলতঃ বিচারে হযরত মির্যা সাহেব সম্মানের সংগে মুক্তি লাভ করলেন। এভাবে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী শান-শওকতের সঙ্গে পূর্ণতা লাভ করেছে।

এই রায় ঘোষণার সময় ডগলাস সাহেব সম্মানিত বিবাদী মির্যা সাহেবকে বললেন যে, তিনি মানহানি এবং ক্ষতিপূরণ দাবী করে মোকদ্দমা করতে পারেন। কিন্তু হযরত সাহেব সংগে সংগে বললেন যে, 'খষ্টানদের সংগে আমাদের মোকদ্দমা আসমানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আমাদের জন্য আসমানী আদালতই যথেষ্ট, দুনিয়ার আদালতে আমরা কোন মোকদ্দমা চালাতে চাই না।' উল্লেখ্য যে, ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয় আকীদার বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী আহমদীয়া জামাত আধ্যাত্মিকভাবে সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

(গ) লর্ড বিশপ রেভারেন্ড জর্জ লেফ্রাই সাহেবের প্রতি চ্যালেঞ্জঃ

জর্জ আলফ্রেড লেফ্রাই ১৮৯৯ সালে লাহোরের বিশপ হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮ই মে ১৯০০ সনে লাহোরের এক জন-সভায় "নিষ্পাপ নবী" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং উহাতে ঘোষণা করেন যে, যীশু-খৃষ্টই একমাত্র নিষ্পাপ নবী। ২৫শে মে ১৯০০ সনে তিনি "জীবন্ত নবী" বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই সভায় আহমদীয়া আন্দোলনের পক্ষ হতে হযরত মির্যা সাহেব কর্তৃক দু'টি প্রচারপত্র বিতরণ করা হয় যাতে উক্ত দু'টি বিষয়ে ইসলামের পক্ষ হতে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি পেশ করা হয়। উপস্থিত বহু সংখ্যক মুসলমানদের পক্ষ থেকে খৃষ্টধর্ম এবং ইসলামের তুলনামূলক আলোচনার জন্য রেভারেন্ড বিশপ সাহেবকে এই মর্মে আহ্বান জানানো হয় যে, মুসলমানদের পক্ষ হতে মির্যা সাহেব এবং খৃষ্টানদের পক্ষ হতে বিশপ সাহেব এই সকল বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করবেন। আনুষঙ্গিক শর্তাবলীসহ বিশপ সাহেবের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু বিশপ সাহেব নানা প্রকার অজুহাত দেখাতে থাকেন। সমকালীন পত্রিকা (দি পাইওনিয়ার, দি ইন্ডিয়ান ডেইলী টেলীগ্রাফ, দি ইন্ডিয়ান স্পেকটটর ইত্যাদি) বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করতঃ বিশপ সাহেবকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অনুরোধ করে, কিন্তু এতদসত্বেও নানা টাল-বাহানা করে তিনি প্রসংগ এড়িয়ে যান। হযরত মির্যা সাহেব দো'আর কবুলিয়তের চ্যালেঞ্জ প্রদান করে বিশপ সাহেবকে জীবন্ত ধর্মের প্রমাণ দেওয়ার আহ্বান জানান। বাইবেল এবং কুরআন উভয় গ্রন্থেই দো'আর কবুলিয়ত সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু বিশপ সাহেব এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ মনে করলেন। বাস্তবক্ষেত্রে প্রার্থনা-যুদ্ধ এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মত সৎ-সাহস তার ছিল না। পুনঃ পুনঃ চ্যালেঞ্জ সত্বেও বিশপ সাহেবের টনক নড়লো না। ফলতঃ ইসলামের গৌরব এবং জীবন্ত ধর্ম হওয়ারই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলো। যারা চক্ষুস্মান তারা বিষয়টির মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। 'ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ' (১৯-৬-১৯০০) লিখেছিল: "We "are of the opinion that the Bishop would do well to accept the Challenge---we should like to see the challenge accepted because we think it would prove highly interesting." সমকালীন পত্রিকা 'দি ইন্ডিয়ান স্পেকটেটর' লিখেছিল: "The Bishop of Lahore seems to have retired with more haste than dignity from a challenge which he had himself provoked."

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী নিদর্শনমূলক প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে তদানীন্তন উত্তর ভারতের বিশপ সাহেবকে নিশ্চুপ করতে পেরেছিলেন প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) (১৯০২ সালের 'রিভিউ অব রিলিজিয়নস' দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) ইউরোপ, আমেরিকা এবং পৃথিবীর জন্য ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের পরাজয় সংক্রান্ত কিছু ঘটনাবলীর কথা আমরা পরে উল্লেখ করবো।

(ঙ) ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্মের অসারতাঃ

হযরত মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ

* "একজন খৃস্টানকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যদি সমস্ত লোক একত্রিত হয়ে এই বিশ্বাস পোষণ করে, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন তাহলে এর ফল কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর এই, ত্রিত্ববাদী খৃস্টধর্ম পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।" ('আহমদী ও গয়ের-আহমদীতে পার্থক্য' পৃ. ৬)

* "তোমরা নিশ্চিন্তভাবে জেনে রাখ, যে পর্যন্ত তাদের (খৃষ্টানদের) খোদা অর্থাৎ ঈসা (আ.) মৃত বলে প্রমাণিত না হয় তাদের ধর্মও মরতে পারে না।"... "কেননা, তাদের ধর্মের মূল ভিত্তিই হচ্ছে মসীহ ইবনে মরিয়ম-এর সশরীরে আকাশে জীবিত থাকা। তাদের এ স্বকপোল কল্পিত ভিত্তিকে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দাও। অতঃপর লক্ষ্য করে দেখ খৃষ্টধর্মের ঠাঁই কোথায়?" ('এযালায়ে আওহামের' পৃষ্ঠা-৫৬০)

যীশু খৃষ্টের মৃত্যু এবং কাশ্মীরে সমাধিস্থ হওয়া এবং এতদসংক্রান্ত প্রমাণাদি ও পুস্তকাবলী সম্পর্কে পূর্বে আলোকপাত করেছি ('মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ' এবং অন্যান্য পুস্তক দ্রষ্টব্য)। এই সকল বিষয় এবং হযরত মির্যা সাহেবের স্বয়ং প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী-সম্বলিত প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী বিশেষভাবে খৃষ্টানদের জন্য ঐশী নিদর্শন স্বরূপ। আকাশ হতে যীশুর পুনরাগমনের ধারণা সম্পুর্ণ ভ্রান্ত। এই মাটির পৃথিবী হতেই যীশুতুল্য ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়া সম্ভব এবং জীবন্ত ধর্ম ইসলামের অনুসারীদের মধ্য হতেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী উপাধি প্রাপ্ত হয়ে সেই মহাপুরুষ যথা সময়ে আগমন করেছেন।

[চলবে]

তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ফযিলত

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

"অমিনাল্-লাইলি ফাতাহায্ যাদ্ বিহী নাফিলা তাল্-লাক, আছ আইঁয়্যাব' আছাকা রাব্বুকা মাক্বামাম্ মাহ্‌মুদা" (১৭:৮০) অর্থাৎ "এবং তুমি নিশীথে উঠিয়া ইহা দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় কর, (ইহা) তোমার জন্য নফল (অতিরিক্ত ইবাদত) স্বরূপ, ইহাতে প্রত্যাশা করা যায় যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদায় উন্নীত করবেন।"

কুরআন করীমের এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে নফল নামাযও আদায়ের জন্য তাগিদ প্রদান করেছেন। তিনি বার বার বান্দাদেরকে নামায কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন করীমে তিনি জিন ও মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "অমা খালাক্বতুল জীন্না ওয়াল ইন্‌ছা ইল্লা লিয়া' বুদুন"- অর্থাৎ "জিন ও মানবকে আমি আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি" (৫১:৫৭)। মানুষের জীবনের আসল ব্রত ও উদ্দেশ্য এটাই। বান্দাদের প্রতি তার নির্দেশের কারণ হলো– "নামায মানুষকে অশ্লীলতা ও যাবতীয় মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে"। নামায মু'মিনদের ইহকাল ও পরকালের সফলতার চাবিকাঠি।" হাদীসে বর্ণিত আছে–"নামায হলো বেহেশ্‌তের চাবি।" দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েমের পরেও আল্লাহ্ তা'লা নফল নামায আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন। বান্দা সারা বছর ফরয নামায আদায়ের পাশাপাশি যেন নফল নামাযের দিকেও মনোযোগ দেয়। নামায ক্লান্তিকর বোঝা নয়, বরং ইহা সাধকের জন্য সুবিধা এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কারণ বিশেষ। নামায একটি ফরয ইবাদত– যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ পায়। খাঁটি ও পবিত্র হৃদয়ে দৃঢ়তার সাথে ইবাদত বন্দেগী করার মধ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নিহিত।

সূরা হুদে বর্ণিত আছে, "এবং তুমি দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির বিভিন্ন অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই উত্তম-কর্ম দূরীভূত করে মন্দ কর্মকে। ইহা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ।" (১১৫ নং আয়াত)

"তাহাজ্জুদ নামায" (অতিরিক্ত ইবাদত) অর্থাৎ নফল নামায" এবং সকল নফল নামাযের সেরা নামায। সে জন্যই কুরআন ও হাদীসে এই নামায নিয়মিত পড়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং এই নামাযের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রাতের শেষ ভাগে ঘুম থেকে উঠে এই নামায পড়তে হয়, সে জন্যে এই নামাযের নাম "তাহাজ্জুদ নামায" অর্থাৎ শেষাংশের নামায।" মহানবী রসূলে পাক (সা.) তাহাজ্জুদ নামায আট রাকাত পড়তেন। মোটকথা তিনি নিয়মতই এই নামায পড়তেন। তাঁর (সা.) এই নামায পড়া আমল ছিল। নীরব নিথর গভীর রাতে মু'মিনের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এই তাহাজ্জুদ নামায সর্বোত্তম সাধনা। নির্জনে একাকী বান্দা ইহার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সঙ্গে গোপনে এক পবিত্র আধ্যাত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করার সুযোগ পায়। এই নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিশেষ সন্তুষ্টি অর্জনম হয়। একজন মু'মিনের মনের অবস্থা কিরূপ হয় যখন সেজদারত অবস্থায় আল্লাহ্‌র অতুচ্চ-মহত্তের গভীর অনুভূতি এবং নিজের দুর্বলতার উপলব্ধি তার আত্মিক চেতনাকে নম্র ও বিনত করে দেয়। বক্তব্যের শুরুর দিকের আয়াতাংশটি এটাই ব্যক্তি করেছে। মু'মিন বান্দা এই সকল আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করার পর সেজদায় প্রণত হয়। সেজদায় প্রণত হওয়ার জন্য যেখানে আদেশ রয়েছে আঁ হযরত (সা.) সেই সকল আয়াতের যে কোনোটি তেলাওয়াত করার পর সেজদা করতেন। রসূল করীম (সা.) তাহাজ্জুদ নামাযকে ফরয নামাযের পর সর্বোৎকৃষ্ট নামায বলে উল্লেখ করেছেন। আর নফল নামায ফরজ নামাযের হেফাজত করে থাকে। নফল নামাযের বহু মহান ও সুন্দর লক্ষ্য রয়েছে।

তিনি (সা.) বলেছেন, "তোমাদের তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা উচিৎ। কেননা তা তোমাদের পূর্বেকার সজ্জনদের প্রতীক এবং তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। শেষ রাতের শেষ প্রহরে সে সময়ে খোদা তা'লা বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হন– আর এতে বান্দার আত্মিক উন্নতি হয়।"

"আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির প্রতি সদয় হন, যে রাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে নিজে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে এবং তার জন্য তার স্ত্রীকেও জাগায়। আর যদি স্ত্রী ঘুম থেকে উঠতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ্ সেই নারীর প্রতিও সদয় হন যে, রাতের ঘুম থেকে ওঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায়। আর স্বামী উঠতে অস্বীকৃতি জানালে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়।" (আবু দাউদ)

পৃথিবীর মানুষ যখন গভীর রাতে সুখ নিদ্রায় বিভোর থাকে, তখন যে বান্দা তার সুখনিদ্রা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র খোদার সন্তুষ্টির জন্য নফল ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। মহামহিম খোদা এ সকল বান্দাদের ওপর খুবই খুশী হন আর তাদের ওপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন। এ সকল ইবাদতকারী মু'মিন বান্দাদের তিনি অতি নিকটবর্তী অবস্থান করেন আর তাদের ডাকে সাড়া দেন! এই সময়ের ইবাদত ও দোয়া তিনি ফিরিয়ে দেন না। কত দয়ালু মহান আল্লাহ্! ইবাদতের উদ্দেশ্য যেমন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন তেমন খুবই খেয়াল রাখতে হবে তাঁর সন্তুষ্টির বদলে যেন বান্দার আত্মগরিমা প্রকাশ না পায়! নামায হলো দোয়া। তাঁর নিকট দোয়ার চাইতে উত্তম কোনো আমল নেই। রমযান মাসের ইবাদতের ফযিলত বছরের অন্যান্য মাসের ইবাদত বন্দেগীর তুলনায় অনেক বেশী। এই মাসের রোযা রাখাই ইবাদতের সমতুল্য কারণ এটা আল্লাহ্‌র হুকুম।

হাদীসে "রোযাকে ইবাদতের দরজা" বলা হয়েছে। যার লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা। রমযানে সেহরী খাবার বরকতের পাশাপাশি যদি একটু সময় বেশী বের করে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা যায় তাহলে মহান আল্লাহ্‌র অতি প্রশংসনীয় মর্যাদার অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনকারী বান্দা হওয়া যাবে। রমযানের পবিত্র রাত্রিগুলিকে মহানবী (সা.) ইবাদত বন্দেগী, কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া দরূদ ও অধিক হারে তওবা-ইস্তেগফার করার মধ্য দিয়ে "জীবন্ত" করে তুলতেন। তিনি (সা.) বলেছেন "ফরয নামাযের ওপর আমল করলে খোদার নৈকট্য লাভ করা যায় আর বান্দা যখন "নফলের ময়দানে" উন্নতি করে তখন আল্লাহ্ পাক তার বন্ধু হয়ে যান। ফলে এমতাবস্থায় তিনি সেই বান্দাদেরকে ভালবাসতে আরম্ভ করেন।" প্রকৃতপক্ষে ফরয নামায ও নফল নামাযের মধ্যে তুলনা এমনই যেমন তুলনা মানুষের দেহের অবয়ব ও তার সৌন্দর্যের মধ্যে বিদ্যমান। অর্থাৎ ফরয নামাযের প্রতি ভালবাসার ফলশ্রুতিতেই নফল নামাযের জন্ম হয়। ফলে বান্দার-সত্তা ও খোদার-সত্তা এক হয়ে যায়। অতএব আমাদের আগামী প্রজন্মকে ঐশী জগত কর্তৃক প্রশংসিত করতে হলে শৈশব কাল থেকেই তাদেরকে প্রকৃত নামায কায়েমকারী বান্দায় পরিণত করুন, আমীন।

জাগো মু'মিন

সিবগাতুর রহমান

উঠো মু'মিন দেখোনা চেয়ে অরুণ রাঙা ভোর
নতুন পৃথিবী গড়িতে হইবে কাটবে সকল ঘোর।
উঠো মু'মিন দেখোনা চেয়ে অরুণ রাঙা ভোর

গহীন আঁধারে ডুবিয়া হইলো হাজার বছর পার
অলস বিলাসে নিদ্রায় রত থাকিও না তুমি আর।
-
মুখোশধারী বেঈমানে দেখো নাশ করে ইসলাম
জাগিতে হইবে আজিকে তোমায় ঘুচাইতে দুর্ণাম।

কত দিবানিশি অবহেলাতে করিয়াছো তুমি গত
চোখ মেলে দেখো দিগন্ত পানে বিজয় সমাগত।

যুগের ইমাম ডাকিছে তোমায় থাকিও না চুপ করে
আলোর দিশারী খলিফা দেখো সকলেল ঘরে ঘরে।

আমরা যদি না জাগি আজো আসিবে যে নবাগত
সাগর সমান চোখের জলেও মুছিবে না সেই ক্ষত।
উঠো মু'মিন দেখোনা চেয়ে অরুণ রাঙা ভোর

নতুন পৃথিবী গড়িতে হইবে কাটিবে সকল ঘোর।
উঠো মু'মিন দেখোনা চেয়ে অরুণ রাঙা ভোর।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানীত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন।

ওয়াসসালাম
খাকসার
সেক্রেটারী ইশায়াত, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

দরূদ শরীফ পড়ার গুরুত্ব ও ফযিলত

মাওলানা ফুরাদ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন–

ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইয়ুছাল্লুনা আলান্নাবী, ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু ছাল্লু আলাইহে ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা।

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ এ নবীর প্রতি রহমত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশ্‌তারাও (এ নবীর জন্য দোয়া করে)। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও এর প্রতি দরূদ এবং অনেক সালাম পাঠাও। (সূরা আল আহযাব: ৫৭)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, রসূলে আকরাম (সা.) এর কার্যাবলী এরূপ ছিল যে, এগুলোর প্রশংসা বা বৈশিষ্ট্য সীমারেখা টানার জন্য আল্লাহ্ তা'লা কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন নি। শব্দ তো পাওয়া যেত। কিন্তু আল্লাহ্ স্বয়ং তা ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ তাঁর (সা.)-এর কর্মের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল সীমাতীত। এ ধরণের আয়াত আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোন নবী (সা.)-এর সম্মানে ব্যবহার করেন নি। তাঁর (সা.)-এর আত্মায় এমন সত্যতা ও বিশ্বস্ততা ছিল এবং তাঁর (সা.)-এর কর্ম খোদার দৃষ্টিতে এতই পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা পরবর্তী লোকদের চিরকালের জন্য এ নির্দেশনা দিয়েছেন যেন তারা কৃতজ্ঞতা ভরে তাঁর (সা.) এর প্রতি দুরূদ পাঠাতে থাকে। (মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ২৪)

* এই আয়াত সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, ইউছাল্লুনা এখানে সালাত এর অর্থ ঃ (১) হামদ ও সানা অর্থাৎ প্রশংসা ও গুণকীর্তন (২) দোয়া (৩) উচ্চস্তরের দোয়া চাওয়া যাতে করে পাপের চিহ্নও মানুষের মাঝে অবশিষ্ট না থাকে। (৪) বিশেষ রহমত। (হাকায়েকুল ফুরকান, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা, ৪১৯)

* হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এখানে আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশ্‌তার জন্য ইয়ুছাল্লু ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'লার জন্য ইয়ুছাল্লু ক্রিয়া আসে তখন তার অর্থ রহমত প্রেরণ হয়ে থাকে এবং যখন ফেরেশ্‌তা বা মানুষের জন আসে, তখন তার অর্থ দোয়া বা ইস্তেগফার করা হয় (আকরাব) (তফসীরে সগীর : ৬৯৫ পৃষ্ঠা)।

* হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দুরূদ প্রেরণের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তিই আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে তার উত্তর দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমার আত্মাকে ফেরত পাঠাবেন যেন আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি। (আবু দাউদ)

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি সালাম প্রেরণকারীকে তার দরূদের এমন প্রতিদান ও সওয়াব মিলবে যেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সালাম ও দুরূদের উত্তর অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রদান করেছেন।

* হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, যিনি হযরত রসূলে করীম (সা.)কে কামনা করে আল্লাহ্ তা'লা তার ওপর শান্তি বর্ষণ করেন। (মুসিলম শরীফ)

* হযরত ইবনে মাসুদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, বিচার দিবসে ঐ সকল লোক আমার নিকটে থাকবে যারা আমার জন্য বেশী বেশী শান্তি (দুরূদ) কামনা করে'।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, ঐ ব্যক্তির ওপর অভিশাপ যার উপস্থিতিতে আমার নাম লওয়া হয় অথচ সে আমার জন্য শান্তি কামনা করে না। (তিরমিযী)

* হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দুরূদ প্রেরণ প্রসঙ্গে বলেন, "পৃথিবীতে লক্ষ পবিত্রচেতা লোক জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন কিন্তু তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রিয় সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব যিনি তাঁর নাম হল হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ তাঁর ওপর দুরূদ পাঠান এবং তোমরাও যারা ঈমান এনেছ তাঁর ওপর দুরূদ পাঠাও এবং তাঁর প্রতি শান্তির সম্ভাষণ জানাও।" (চশমায়ে মা'রেফাত)

এখন আমি দুরূদ শরীফ পাঠ করার ফযিলত সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। গোলাম রসূল রাজেকী সাহেবের নাম সবাই জানেন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন এবং আহলে কাশফ ছিলেন। তাঁর ওপর ইলহাম হতো। তাঁর ঘরে একটি চড়ুই পাখীর বাসা ছিল। কাজের লোক তাঁর বাসা পরিস্কার করছিল, এমন সময় তিনি কোন কাজে বাহিরে যান, বাহির থেকে এসে দেখেন কাজের লোক পরিষ্কার করার সময় পাখির বাসাটিও ঝড়ু দিয়ে ফেলে দেয়। তিনি লক্ষ্য করলেন পাখিরা অনেক কান্নাকাটি করছে। তিনি বলতে লাগলেন, আমি এখন কি করবো বা কিভাবে তাদের সান্তনা দিব? তিনি বলেন, তাহলে আমি কেন দুরূদ শরীফ পাঠ করবো না? যেইনা তিনি দুরূদ শরীফ পড়া শুরু করলেন পাখিরা কান্না বন্ধ করে দেয়। তিনি যখন দুরূদ বন্ধ করে দেন

পাখিরা আবার কান্নাকাটি আরম্ভ করে দেয়। এভাবে তিনি দুরূদ পড়লে পাখি কান্না বন্ধ করে দেয় আবার তিনি দুরূদ পড়া বন্ধ করে দিলে পাখি কান্না শুরু করে দেয়। এক পর্যায়ে পাখি উড়ে চলে যায়। পাঠক! অনুভব করুন দরূদ পাঠের ফযিলত।

* আরেকটি ঘটনা আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই। আর তা হলো ১৯৭০ সালে খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) পশ্চিম আফ্রিকাতে সফরে যান। তখন হুযূরকে বলা হলো, হুযূর আপনাকে ইংরেজিতে টাউন হলে বক্তৃতা দিতে হবে আর মানুষ ইতোমধ্যে জড়ো হয়ে গেছে। হুযূর বলেন, You didn't take my permission, তুমি তো আমার অনুমতি নাও নাই। মোবারক আহমদ নাজির সাহেব বলেন, তখন হুযূর দুরূদ শরীফ পড়ে বক্তৃতা দিতে যান এবং বক্তৃতা শেষে খলীফা সালেস (রাহে.) বলেন, আমার মনে হয়েছে বক্তৃতা আমি বলিনি বরং পিছন থেকে কেউ একজন বলছে।

* আমি আপনাদেরকে আরেকটি ঘটনা বলছি। আর তা হলো মাওলানা নাসিম মাহদী সাহেবকে কোথাও বক্তৃতা দিতে বলা হলো, তো তিনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন সাথে তার বিবিও ছিল। নাসিম মাহদী সাহেব শুধু দুরূদ শরীফ পড়েছেন। এমতাবস্থায় তার বিবি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেন কিন্তু তিনি তা জানেন নি বরং তিনি দুরূদ পড়া নিয়ে ব্যস্ত। তখন তাঁর বিবি বললেন, "লাগে রাহা ফের আজ ভি তাকরীর তৈয়ার নেহী কি" অর্থাৎ মনে আছে আজকেও বক্তৃতা প্রস্তুত করে নি।

* আরেকটি ঘটনা আপনাদেরকে জানাতে চাই। আর তা হলো মোবারক আহমদ নাজির মিশনারী ইনচার্জ কানাডা। তিনি বলেন, আমি রসায়নে অনেক দুর্বল ছিলাম। তাই দোয়ার জন্য মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেবের কাছে যায়। তিনি আমাকে বলেন, বেশী বেশী দুরূদ পড় আর মসীহ্ মাওউদের আরবী কাসীদা মুখস্থ করো। সবার অবগতির জন্য বলছি, আরবী কাসিদা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সানে রচিত। তিনি বলেন, আমি তাই করলাম এবং পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করলাম। তিনি বলেন আরবী কাসীদা পড়ে আমার তিনটি দিক ভাল হয়েছে। (১) রসূলকে ভালবাসতে শিখলাম (২) মেধার উন্নতি হয়েছে ও (৩) ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করতে পারলাম।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও বয়আত করার গুরুত্ব

আব্দুল খালেক তালুকদার

ইমাম মাহ্‌দীর আগমন হবে এটা ইসলাম ধর্মে সর্বজন স্বীকৃত একটি বিষয়। বিগত চৌদ্দশ বছরে মুসলমানদের মাঝে অনেক দলাদলি হয়েছে, ফির্কাবাজী হয়েছে, শতশত ফির্কার জন্ম হয়েছে। হাজারো মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শেষ যুগে ইমাম মাহ্‌দী আসবেন এ বিষয়ে কারো মাঝে তেমন কোন মতভেদ নেই বললেই চলে। তাই বিষয়টি যাচাই করা প্রয়োজন।

কোন্ যুগে আসবে?

ইমাম মাহ্‌দী শেষ যুগে আসবেন। আর শেষ যুগ কিয়ামতের পূর্বে আসবে। এই কিয়ামত কখন আসবে এ প্রসঙ্গে মহনবী (সা.) বলেছেন–

من سره ان ينظر الي يوم القيامة كانه راي عين فليقرأ (اذا الشمس كورت)و (اذا السماء انفطرت) و(اذا السماء انشقت)

অর্থ: কেউ যদি কিয়ামতের দৃশ্য চাক্ষুষ দেখতে চায়। তাহলে সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতর এবং সূরা ইনশিকাক পড়ে। (তিরমিযী শরীফ, কিতাবুত তাফসীর)

উপরোক্ত সূরাগুলো পড়ে দেখেন, এতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর তেরশ বছর পর যে যুগ অতিবাহিত হচ্ছে এর দৃশ্যাবলীই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে–

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝

অর্থ:- উটগুলো বেকার হবে। (সূরা আত্ তাকভীর: ৫)

আর মহানবী (সা.) বলে গেছেন–

ليتركن القلاص فلا يسعي عليها

উট পরিত্যাক্ত হবে এতে কেউ আরোহন করবে না। (মুসলিম শরীফ) আর আপনারা সবাই জানেন, বর্তমানে উট বেকার। এতে কেউ চড়ে না। কেন কেউ এতে চড়ে না। কারণ ইঞ্জিন চালিত যানবাহন এর জায়গা দখল করেছে। যেমন– রেলগাড়ী, বাস, ট্রাক, স্টিমার, উড়োজাহাজ, কার ইত্যাদি।

এ সূরাতে আরও বলা হয়েছে–

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝

অর্থ: এবং বন্য জীবজন্তুদের একত্র করা হবে। (সূরা আত্ তাকভীর: ৬) আজ দেশে দেশে চিড়িয়াখানার মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণী আজ পূর্ণ হয়েছে।

বলা হয়েছে–

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝

অর্থ: এবং সাগরগুলোকে (নিয়ন্ত্রিত করে একটিকে অন্যটির মধ্যে) যখন প্রবাহিত করা হবে। (সূরা আত্ তাকভীর: ৭) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খাল এবং ১৯১৪ পানামা ক্যানেল খননের মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়। সুয়েজ খালের

মাধ্যমে লোহিত ভুমধ্য সাগর এবং পানামা ক্যানেলের মাধ্যমে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে মিলানো হয়েছে।

বলা হয়েছে–

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١١﴾

অর্থ: এবং পুস্তক পুস্তিকা যখন ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হবে, (সূরা আত্ তাকভীর: ১১)। ছাপাখানার মাধ্যমে এটা পূর্ণ হয়েছে।

বলা হয়েছে–

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١٢﴾

অর্থ:- এবং আকাশের আবরন যখন খুলে ফেলা হবে, (সূরা তাকভীর: ১২)। আজ মানুষ বাধহীনভাবে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়া মহাকাশ বিজ্ঞানেও প্রভুত উন্নতি লাভ করেছে।

এগুলো হলো কিয়ামতের লক্ষণ। আর কেয়ামতের আগে মাহদী আসার কথা। কিয়ামতের লক্ষণ প্রকাশ হয়ে গেল আর মাহদী এলেন না এটা কেমন কথা! মুসলমান হিসেবে আপনাদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন আজ মাহদী কোথায়?

এ ছাড়াও কুরআন হাদীস অনুযায়ী শেষ যুগের অর্থাৎ ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর যুগের অনেকগুলো লক্ষণ রয়েছে। সেগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন:

১. মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য ও দলাদলি। ২. মিথ্যা ও দুর্নীতির সর্বগ্রাসী প্রাদুর্ভাব। ৩. বিধ্বংসী আগ্নেয়াস্ত্রধারী পরাশক্তি তথা ইয়াজুজ-মাজুজের উত্থান। ৪. ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টান তথা দাজ্জালের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন। ৫. সুদ, জুয়া, ও ব্যভিচারের ছড়াছড়ি। ৬. নর্তকী ও গায়িকাদের প্রাধান্য। ৭. উঁচু উঁচু অট্টালিকা নির্মাণের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আগমন স্থল

সেভাবে আগমনস্থল সম্পর্কেও বলে দেয়া হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন–

فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق

শুভ্র মিনারের কাছে দামেস্কের পূর্ব দিকে তাঁর আগমন হবে। (মুসলিম শরীফ কিতাবুল ফিতান)। ওয়ার্ল্ড ম্যাপ দেখলে দেখবেন দামেস্কের সোজা পূর্ব দিকেই ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ান। আর এখানেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর জন্ম।

মহানবী (সা.) হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-এর কাধে হাত রেখে বললেন–

لو كان الايمان عند ثريا لناله رجال او رجل من هؤلاء

(বুখারী শরীফ, কিতাবুত তফসীর, সূরা জুমুআর তফসীর) যদি ঈমান সুরাইয়্যা নক্ষত্রেও চলে যায়। মিথ্যায় জগত ছেয়ে যায, তবুও আল্লাহ্ তা'লা এদের বংশধর হতে অর্থাৎ পারস্য বংশ থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তির আগমন ঘটাবেন এই হারানো ঈমানকে ফিরিয়ে আনার জন্য।

ইমাম মাহদীকে মানার গুরুত্ব

আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) এবং সব নবীদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٢﴾

অর্থ: আর (স্মরণ কর) আল্লাহ্ যখন (আহলে কিতাবের কাছ থেকে) সব নবীর (মাধ্যমে এই বলে) অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'আমি কিতাব ও প্রজ্ঞার যা-ই তোমাদের দেই, এরপর তোমাদের কাছে যা রয়েছে এর সত্যায়নকারী কোন রসূল তোমাদের কাছে এলে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে?' তারা বললো, '(নিশ্চয়ই) আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।' (সূরা আলে ইমরান: ৮২)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٨﴾

অর্থ: আর স্মরণ কর আমরা যখন নবীদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমার কাছ থেকেও। এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার কাছ থেকেও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। আর আমরা এদের সবার কাছ থেকে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। (সূরা আল আহযাব: ৮) অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর কাছ থেকেও এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে তাঁর পরে তাঁর সত্যায়নকারী আসলে যেন তাঁকে মানা হয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার এভাবে নিয়েছিলেন– তিনি বলে গেছেন,

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ

আর যখন তোমরা তাকে দেখতে পাবে তোমরা তার বয়আত করো, যদি বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল্-মাহদী। (সুনানে ইবনে মাজা: কিতাবুল ফিতান, বাব খুরূজুল মাহদী)

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থ: যে ব্যক্তি যুগ ইমামের হাতে বয়াত না করে মারা গেছে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করেছে। (সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমরাহ) তাই ইমাম মাহদীর বিষয়টি যাচাই বাছাই করে তাঁকে মান্য করা প্রত্যেক মুসলমানের এক আবশ্যকীয় দায়িত্ব। আমি সংবাদ পৌঁছালাম। অনুসন্ধান করে মানা ও না মানা এটা আপনাদের কাজ।

নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

[২০১৪ সালে বাংলাদেশ সালানা জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

(জামেয়ার সাময়িকী 'নূরউদ্দিন' থেকে পুনর্মূদ্রিত)

মামুন-উর-রশীদ, ওয়াকেফে যিন্দেগী

ইসলামী পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতসমূহের মাঝে একটি হল, নামায। আমরা জানি, নামায ফারসী শব্দ। এর আরবী হল সালাত। আমরা সাধারণত নামায পড়ি বা নামায পড়া বলে থাকি। নামায পড়া কথাটি একদমই সাধারণ কথা যার মধ্যে মনোযোগ থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, **'আক্বীমুস্ সালাতা'** অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর। মহান আল্লাহ্ যেভাবে চান সেভাবে নামাযকে প্রতিষ্ঠা করাই হল **'আক্বীমুস সালাত'**। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই নামায নামের প্রোগ্রামটি দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু পূর্ব থেকেই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এমন কোন নবী-রসূল জগতে আসেন নি যিনি এই নামাযকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করেন নি। শুধু তাই নয় নামায হল একমাত্র সেই নীতি যার ওপর প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষ একমত পোষণ করে।

আমরা জানি এই পৃথিবী খোদার পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ ধর্ম হিসেবে ইসলাম ধর্ম প্রেরিত হয়েছে। আর সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ শরীয়ত হল **'কুরআন'** যা কিনা আমাদের প্রিয় নবী, নবীকুলের শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতরণ করা হয়েছে। আমরা এ-ও জানি, জীবনের প্রতিটি কাজেই কুরআন করীমের শিক্ষার বাস্তবায়ন রয়েছে। আর এরই একটি প্রধান দিক হল, **'ইবাদত'** যা কিনা নামাযের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। এখন সালাত শব্দের অর্থ শুদ্ধ বাংলা ভাষায় কী হয় তা দেখা যাক। সালাত শব্দের অর্থ হল, **'প্রেমাস্পদের নিকট মর্মজ্বালার বেদনাপূর্ণ অনুরাগভরা বিনীত নিবেদন'**।

কুরআন করীম আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয়, প্রত্যেক নবী-রসূল জগতে এসে নামায এবং ইবাদতের আদেশ দিয়ে গেছেন। এরই কিছু দৃষ্টান্ত এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

১. হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) আর স্ত্রী হাজেরাকে আরবের নির্জন মরুভূমিতে রেখে আসেন তখন তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে এটি করেছিলেন?

رَبَّنَآ اِنِّیۡۤ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِکَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ

'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আমি আমার সন্তানদের কয়েকজনকে তোমার সম্মানিত গৃহের কাছে এক অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করালাম। হে আমার প্রভু! (আমার এমনটি করার কারণ হল) তারা যেন নামায কায়েম করে।' (সূরা ইব্রাহীম: ৩৮)

উক্ত আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় একমাত্র নামায প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি এমনটি করেছিলেন।

২. হযরত ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কে কুরআন সাক্ষ্য দেয়, "সে তাঁর পরিবার-পরিজনকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতো।" (সূরা মরিয়ম: ৫৬)

৩. হযরত লুত (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.) এবং তাঁদের বংশধরদের মধ্যে থেকে আগত নবীদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণনা রয়েছে, "আমরা তাদের প্রতি সৎকাজ করতে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওহী করতাম।"

৪. হযরত লুকমান (আ.) নিজ পুত্রকে নসীহত করে বলেছেন, "হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি নামায প্রতিষ্ঠা কর।" (সূরা লুকমান: ১৮)

৫. হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে আসে, "আমি যতদিন জীবিত থাকি তিনি আমাকে নামায ও যাকাত আদায় করার তাগিদ দিয়েছেন।" (সূরা মরিয়ম: ৩২)

৬. পরিশেষে হযরত নবী করীম (সা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَاۡمُرۡ اَہۡلَکَ بِالصَّلٰوۃِ وَاصۡطَبِرۡ عَلَیۡہَا ؕ

"তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের তাগিদ করতে থাক এবং নিজেও এতে প্রতিষ্ঠিত থাক।" (সূরা ত্বা-হা: ১৩৩)

বিভিন্ন নবীরা তাদের যুগে নামায প্রতিষ্ঠার প্রতি কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে গেছেন তা এতক্ষণ আমরা জানতে পারলাম। এবার একটু শাব্দিক এবং অর্থগত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন আর এজন্য আমি

আপনাদের সামনে **'ইক্বামাতুস সালাত'**-এর সেই বহুমূল্যবান ছয়টি অর্থ তুলে ধরব যা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁর **'তফসীরে কবীর'**-এর মধ্যে তুলে ধরেছেন।

'ইক্বামাতুস সালাত' অর্থাৎ নামায প্রতিষ্ঠা করা। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর **'তফসীরে কবীর'** থেকে এর ছয়টি অর্থ নিম্নরূপ:

১. নিয়মিত নামায আদায় করা–

নামায ফরয হবার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন এক বেলার নামায বাদ গেলে এটি বলা যাবে না যে, সে নামাযের ওপর পূর্ণ আমলকারী ব্যক্তি ছিল।

প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ থেকে যে ব্যক্তি নিজেকে পাশ কাটিয়ে নিয়ে যায় সে তো স্বয়ং তার ভালোবাসার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা আছে, "যারা তাদের নামাযে সদা প্রতিষ্ঠিত থাকে।" (সূরা মা'আরেজ: ২৪)

২. মধ্যপন্থা এবং যথার্থতার সাথে নামায আদায় করা–

এখানে বাহ্যিকতাকে বুঝানো হচ্ছে যেমন: ঠিকভাবে ওযূ করা, সঠিক সময়ে নামায আদায় করা, রুকু সিজদা ভালভাবে করা, সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করা ইত্যাদি।

অনেকে কাপড়-চোপড় নোংরা আছে এই অজুহাত দেখায় অথবা সফরে রয়েছে বলে নামায পরিত্যাগ করে–এগুলি সবই শয়তানের প্ররোচনা। যতক্ষণ পর্যন্ত সামর্থ্য আছে, চেষ্টা থাকা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ তা'লা কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনে বলা আছে, "যারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে।" (সূরা মোমেনুন: ৩)

৩. সর্বদা নামাযকে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে–

অনেকে মনে করতে পারে নামায কি কোন বস্তু যে সেটিকে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে? আসলে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রভাব থেকে নামাযকে মুক্ত রাখতে হবে। বাহ্যিক প্রভাব যেমন: শব্দ, অন্যদের আচরণ লক্ষ্য করা, সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ প্রভৃতি। অভ্যন্তরীণ প্রভাব যেমন: মনের ভিতর উদয় হওয়া বিভিন্ন চিন্তা। এ বিষয়টিও কুরআনে রয়েছে। বলা হয়েছে, "এবং যারা অধ্যবসায়ের সাথে নিজেদের নামাযের তত্ত্বাবধান করে।" (সূরা মোমেনুন: ১০)

৪. নিজে আদায় করার পাশাপাশি অন্যদেরকেও ডাকা–

যারা অন্যদেরকেও নামাযে যাবার জন্য ডাকে তারা তাদের নামায প্রতিষ্ঠা করে ফেলল। রমযানে যারা অন্যদেরকে তাহাজ্জুদের জন্য ডাকে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

"আর তুমি তোমার পরিবার পরিজনকে নামাযের জন্য তাগিদ করতে থাক এবং তুমি নিজেও এতে প্রতিষ্ঠিত থাক।" (সূরা ত্বা-হা: ১৩৩)

৫. নামায জামা'তের সাথে আদায় করা–

বাজামা'ত নামাযের আগে এজন্যই ইক্বামত দেয়া হয়। আর এর নাম **'ইক্বামত'** এজন্যই রাখা হয়েছে। বর্তমানে এই জিনিসটির অভাবের কারণেই মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে।

কুরআন করীম অনুযায়ী নামায তখনই সম্পন্ন হয় যখন তা জামা'তের সাথে হয়। কেননা কুরআনের কোথাও একাকী নামাযের উল্লেখ নেই। বাজামা'ত নামাযে আল্লাহ্ কিছু ব্যক্তিগত এবং কিছু জাতিগত উপকারিতা রেখেছেন। আর এমনিতেই মানুষ উপকার ছাড়া কোন কাজ করে না। নামায আদায় করার ফলে যেসব উপকার লাভ হয় তা হল:

১. এক নেতার অধীনে চলার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

২. নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

৩. সমাজে সাম্য, একতা ও ভ্রাতৃত্ব আনে।

৪. বাহ্যিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা আনে।

৫. একাগ্রচিত্ততার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

৬. পাপ হতে মুক্তি দেয় এবং পুণ্য কর্মে শক্তি দেয়।

৭. আল্লাহ্ তা'লার সাথে কথোপকথনের দ্বার খুলে যায় এবং ঈমানবর্ধক ঐশী নিদর্শন দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়।

৮. নামাযের দ্বারা মানুষের সকল সমস্যা দূরীভূত হয় এবং সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং হৃদয়ে শান্তি নেমে আসে।

৯. এর সাহায্যে মানুষ নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে এবং অপরের জীবনেও। এমনকি জাতীয় জীবনেও পরিবর্তন সাধিত হতে পারে যেমনটি নবীদের জীবনে পরিদৃষ্ট হয়।

১০. এটি মানুষ ও জাতিকে মহা সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে ইহকালে চিরস্মরণীয় এবং পরকালে মহা সাফল্যের অধিকারী করে।

অসুস্থতা, শহরের বাইরে অবস্থান করা, ভুলে যাওয়া এবং অন্যান্য মুসলমান উপস্থিত না থাকা–এই চারটি কারণ ব্যতিত যদি কেউ নামায জামা'তের সাথে আদায় না করে তবে তার নামায হবে না এবং সে নামায পরিত্যাগকারীদের মধ্যেই শামিল হবে।

৬. সজাগ এবং সচেতনতার সাথে নামায আদায় করা–

নামাযে অলস হওয়া যাবে না। এজন্যই মহানবী (সা.) নামাযের মধ্যে কোন কিছুর সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো বা কনুই মাটিতে লাগানো- এগুলো করতে নিষেধ করেছেন এবং রুকুতে কোমর সোজা রাখতে বলেছেন। এছাড়া সিজদার সময় শরীরের সমস্ত ভার হাতের তালু, হাঁটু, পা এবং কপালের ওপর রাখার নির্দেশটিও এ অর্থেরই তাৎপর্য। এ সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে এসেছে,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

"অতএব, দুর্ভোগ এমন সব নামাযীদের জন্য যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন।" (সূরা আল মাউন: ৫-৬)

সুধী পাঠকগণ! আপনারা এতক্ষণ অতি মূল্যবান সেই ছয়টি অর্থ পড়লেন যার মাধ্যমেই আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে গেছে, নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব কত বেশি। এটি যে একটি কঠিন কাজ তা-ও আমাদের সামনে পরিষ্কার। এখন প্রশ্ন হল, উপায় কী? উপায় হল, মহানবী (সা.)-এর কথা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা, তাঁর (সা.) সাহাবীদের ঘটনা মনে রেখে সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করা। আর আহমদীদের দায়িত্ব তো আরো বেশি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যিনি রসূলে করীম (সা.)-এর দাসত্বের কল্যাণে নবী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁর আদেশাবলীও মানতে হবে। উক্ত ছয়টি অর্থের মধ্যে প্রতিটিই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে এভাবে বলাই সমীচীন হবে, ছয়টি মিলেই নামায প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে নামায জামা'তের সাথে আদায় করা অধিক গুরুত্ব বহন করে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। একাকী কোন নামাযের কথা বলেন নি। এ প্রসঙ্গে আমাদের নবী করীম (সা.) বলেন, "বাজামা'ত নামায আদায়কারী ব্যক্তি সাতাশগুণ বেশি সওয়াবের অধিকারী হবে।"

তিনি (সা.) আরো বলেন, "যারা দূর হতে নামাযের জন্য আসে তাদের সওয়াব অনেক বেশি।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান)। অন্যত্র একটি হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

"পাঁচ নামাযের ব্যাপারটি আসলে এরকম, কোন ব্যক্তির ঘরের পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় আর সে সেখানে পাঁচ বার একদিনে গোসল করে। ফলে তার শরীরে আর কোন ময়লা থাকে না।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ) এর অর্থ হল, মসজিদে গিয়ে প্রত্যহ পাঁচ বেলার নামায জামা'তের সাথে আদায় করতে হবে।

এখন দেখা যাক এ যুগের ইমাম হযরত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর আগমনের কী উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "অতঃপর তোমরা সতর্ক হয়ে যাও এবং প্রকৃতই পুণ্য-হৃদয়ের অধিকারী ও শান্ত স্বভাবের ও নিষ্ঠাবান হয়ে যাও কেননা পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং চারিত্রিক অবস্থা যাচাই করে তোমাদেরকে শনাক্ত করা হবে। (ইশতেহারাত, তয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "মহানবী (সা.) যখনই কোন দুঃখ-কষ্ট বা বিপদের সম্মুখীন হতেন তখনই তিনি নামায পড়তে দাঁড়িয়ে যেতেন। আমার নিজের এবং যে সমস্ত সত্যান্বেষী ব্যক্তি গত হয়েছেন সবার অভিজ্ঞতা এটাই, নামায ব্যতিত খোদার নৈকট্য অর্জনের অন্য কোন পথ নেই। (মলফূযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১০)

নামাযের কাজ কী? এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "সেই অন্ত:করণ যা পাপে পরিপূর্ণ এবং আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞান হতে দূরে পড়ে আছে, তাকে পবিত্র করা এবং দূর হতে নিকটে আনাই নামাযের কাজ।" (মলফূযাত, ১ম খণ্ড)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামাতের সদস্যদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, "যখনই দুঃখ বা বিপদের সম্মুখীন হও তখনই সঙ্গে সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়ে যাও এবং দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ খোদার সমীপে খোলাখুলিভাবে পেশ কর। কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা আছেন এবং একমাত্র তিনিই যিনি প্রত্যেক প্রকার বাধা-বিঘ্ন ও বিপদ-আপদ হতে মানুষকে উদ্ধার করেন। (মলফূযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১১০)

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত বিনম্রচিত্তে, ভীত হয়ে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন এবং এই আয়াত পড়তেন, **'ওয়া'মুর আহলাকা বিস সালাতি'**। (মুয়াত্তা, কিতাবুল সালাত)

যেদিন হযরত উমর (রা.) আহত হয়েছিলেন ঐ দিবাগত রাত্রে লোকেরা ফজরের নামাযের জন্য বেদারী করছিল আর বলছিল, যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করে ইসলামে তার কোন ঠাঁই নাই। উমর (রা.) এতটাই আহত হয়েছিলেন যে, তখনও রক্ত পড়ছিল। ঐ কথা শুনে তিনি তখন ঐ অবস্থাতেই নামায পড়লেন। (বুখারী, কিতাব সালাতুল খওফ)

মহানবী (সা.)-এর যুগে মহিলা সাহাবীরাও বাজামা'ত নামাযের জন্য মসজিদে যেতেন। (বুখারী, কিতাবুল জুমুআ)

হযরত আলহাজ্জ হেকীম মাওলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) যখন মদীনায় ছিলেন তখন একদিন যোহরের নামায বাজামা'ত আদায় করতে পারেন নি। ফলে তিনি এতটাই কষ্ট পান এবং নিজের মধ্যে অনুশোচনা হয়, তিনি মনে করেছিলেন কবীরা গুনাহ করে ফেলেছেন আর এর কোন ক্ষমা নেই। (হায়াতে নূরুদ্দীন)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "যদি দশ দিনও নামাযকে নিষ্ঠার সাথে আদায় করা হয় তবে হৃদয় আলোকিত হয়ে যায়। স্মরণ রাখ! প্রথা এক জিনিস আর নামায অন্য জিনিস। নামায এমন জিনিস, খোদার নৈকট্য অর্জনের জন্য যার চেয়ে নিকটতম মাধ্যম আর নেই। এটি নৈকট্যের চাবিকাঠি। এর ফলে দিব্যদর্শন লাভ হয়। এ থেকেই ইলহাম এবং খোদার সাথে কথোপকথন সম্ভব হয়। এটি দোয়া কবুল হবার একটি মাধ্যম। কিন্তু যদি কেউ এটিকে বুঝে আদায় না করে তবে সে কেবল একটি প্রথা এবং অভ্যাসের অনুগত থেকে যায়।" (তফসীরে সূরা আল বাকারা, পৃ: ৫১)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেন, 'ইসলামের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যতদিন পর্যন্ত উম্মতে মুসলেমাহ্ খোদার ঘর অর্থাৎ মসজিদকে আবাদ রেখেছে ততদিন তাদের নিজ নিজ ঘরও আবাদ ছিল এবং আহমদ (সা.)-এর বাগানে কেবল বসন্তকালই বিরাজমান ছিল কিন্তু যেইমাত্র মসজিদকে বিরান অবস্থায় ফেলে রেখে নিজেদের ঘর আবাদ করা হল তখনই বিভিন্ন ধরণের দুর্যোগ তাদেরকে গ্রাস করল। সুতরাং নামাযকে প্রতিষ্ঠা করাই হল উম্মতে মুসলেমার প্রাণ এবং মসজিদ আবাদ করার মাধ্যমেই নিজেদের ঘর আবাদ হয়ে থাকে।" (হাকীকাতে নামায, পৃ: ২০৩)

নামায প্রতিষ্ঠার যে সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে মহানবী (সা.) নিজের জীবনে তা করে দেখিয়েছেন এবং সাহাবীদেরকেও সেই পরামর্শ দিয়েছেন।

আর সাহাবীরাও তা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে এতটাই আলোকময় করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের সময় যখন সাহাবীরা যুদ্ধের ময়দানে বিপদসঙ্কুল অবস্থায় ছিল তখন মহানবী (সা.) নিজ প্রভুর সমীপে কেঁদে কেঁদে এই দোয়া করেছিলেন,

"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ইন তুহলিক হাযিহিল ইসাবাতা মিন আহলিল ইসলামি লা তু'বাদা ফিল আরযি আবাদা"

অর্থাৎ,"হে আমার প্রভু! যদি তুমি আজ ইসলামের এই দলটিকে ধ্বংস করে দাও তবে এই ভূপৃষ্ঠে তোমার ইবাদত করার আর কেউ থাকবে না।"

এ কথাটিই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) স্মরণ করিয়ে বলেন–

"হে আহমদী যুবক, বৃদ্ধ, শিশু এবং মহিলারা! তোমরা সংখ্যায় নগণ্য, দুর্বল এবং কম পুঁজিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বের বড় বড় শক্তির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরীক্ষায় লিপ্ত হয়েছে বরং এভাবে বলা যায়, হিমালয় পর্বতের তুলনায় একটি সরিষা দানা যে শক্তি রাখে সে শক্তিও তোমাদের কাছে নেই। এমতাবস্থায় তোমরা যদি বিজয়ী হতে চাও এবং বৃহৎ শক্তিশালীদেরকে পরাভূত করতে চাও তবে উঠে পড় এবং মুহাম্মদে আরাবী (সা.)-এর সেই দোয়ার সত্যায়নকারী হও যা তিনি বদরের প্রান্তরে করেছিলেন। তোমরা তোমাদের ইবাদতের ওপর এতটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও এবং এমন নিষ্ঠার সাথে নামায আদায় কর যাতে মনে হয় নামাযের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে তোমরা জীবিত আছ এবং তোমাদের নিঃশ্বাসে নামায উজ্জীবিত আছে। যদি তোমরা এমনটি করতে পার আর খোদা তোমাদেরকে তা করতে পারার সামার্থ্য দিন তবে নিশ্চিত জেনে রেখো, খোদার নিকট মুহাম্মদ (সা.)-এর আত্মা তোমাদের স্বপক্ষে, আবারো বলছি, হ্যাঁ, তোমাদের স্বপক্ষে আরও একবার এই দোয়া করবে– **"আল্লাহুম্মা ইন আহলাকতা হাযিহিল ইসাবাতা ফালান তু'বাদা ফিল আরযি আবাদা"**।

"হে আল্লাহ্! তুমি যদি এই দলটিকে ধ্বংস করে দাও তবে চিরদিনের জন্য এই ভূপৃষ্ঠে কেউ তোমার ইবাদত করবে না।" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই জামা'তকে যদি তুমি আজ ধ্বংস হতে দাও তবে এই জগতে কখনো তোমার ইবাদত করা হবে না।

আরো একটি ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। আপনারা সবাই হুনায়নের যুদ্ধের কথা জানেন। মক্কা বিজয়ের পর প্রথম যুদ্ধ এটি যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বেশি এবং কাফেরদের সংখ্যা ছিল কম। কাফেররা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল এবং ওপর থেকে অতর্কিত হামলা হবার ফলে মুসলমানদের ঘোড়া, উট থেমে যায় এবং সামনে অগ্রসর হতে চায় না। তখন মহানবী (সা.) একেবারেই একা হয়ে পড়েন। তাঁর (সা.) সাথে এক-দুইজন সাহাবী ছিলেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলেন, তাদেরকে বল, হে আনসার এবং মুহাজেরগণ! খোদার রসূল তোমাদেরকে ডাকছেন। সাহাবীদের কানে যখন এই শব্দ পৌঁছল তখন তাদের উট এবং ঘোড়া অগ্রসর হতে চাইল না। তখন তারা সেগুলোর গর্দান তরবারী দিয়ে কেটে ফেলে এবং মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে যায়। (সীরাতুন নবী (সা.) ইবনে হিশাম, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ১১৩)

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, "হে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জাতি! হে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর গোলামেরা! আজকে আমি তোমাদেরকে কুরআন এবং খোদার রসূলের আহ্বান পৌঁছে দিচ্ছি, খোদার রসূল তোমাদেরকে ইবাদতের জন্য ডাকছে। যদি তোমাদের প্রবৃত্তির উটনী এবং ইচ্ছা-আকাঙ্খার বাহনগুলোকে বশ করতে না পার, যদি সেগুলোর গর্দান বাঁকা না হয়, না ঘুরে দাঁড়ায় তবে সেগুলোর গর্দান কেটে ফেল। নিজের কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির (অবাধ্য ঘোড়ার) ওপর ছুরি চালাও। আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক বলতে বলতে দৌঁড়ে মসজিদের দিকে আস, মসজিদকে আবাদ কর কেননা এর মাধ্যমেই আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, আবাদ হবে। এর মাধ্যমেই তোমাদের ঘর আবাদ হবে এবং এর ফলেই বিচার দিবসে রহমতের ছায়া তোমাদের ওপর থাকবে। এ ব্যতিত অনুগ্রহের কোন দরজা খোলা নেই। এটিই ইবাদতের সেই মহান পথ যা নিয়ামতের রাজপথে চিরদিনের জন্য তোমাদেরকে পরিচালিত করবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলের সহায় হোন। (আমীন) [নামায প্রতিষ্ঠার ওপর ১৯৭৬ সালের সালানা জলসার বক্তৃতা, পৃ: ২৯৪]

যুক্তরাজ্য মজলিসে শূরার উদ্দেশ্যে আহমদীয়া মসুলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধানের ভাষণ

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন

ইসলামের প্রচারের জন্য জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সাহসের প্রয়োজন

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৭ জুন ২০১৮

গত ২৩ জুন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের মজলিসে শূরা-কে উদ্দেশ্য করে এক ঈমানোদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন।

মজলিস-এ-শূরা হল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে প্রতিষ্ঠিত মূল পরামর্শ সভা যেখানে ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রচারে এ জামা'তের কর্মকান্ডকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার বিষয়ে প্রস্তাবসমূহ আলোচিত হয়। প্রায় পাঁচশত প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথি এ শূরায় যোগদান করেন।

লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে পৌঁছে সম্মানিত হুযূর দুই দিনের এ সমাবেশের উদ্দেশ্যে ৪০ মিনিট বক্তব্য রাখেন। এ সময় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন: **"শূরার প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের পূর্ণ বিনয় অবলম্বন করা উচিত আর কখনো মনে করা উচিত না যে আপনার মতামত অন্য কারো মতের চেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে। এমন বিনয়ের চেতনা এটি নিশ্চিত করবে যে শূরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের এক পরিবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ফলে ইতিবাচক মত বিনিময় ও উচ্চতর মানের আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।"**

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন: **"শূরার প্রত্যেক সদস্যের অনুধাবন করা আবশ্যক যে তাক্‌ওয়া ছাড়া অন্য কোন কিছুই অর্জিত হতে পারে না, আর এ তাক্‌ওয়া ছাড়া শত আলোচনা ও বিতর্ক কোন দিন সুফল বয়ে আনতে পারবে না। তাকওয়ার দাবি এই যে, আপনার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার স্থায়ী এক ভীতি বিরাজ করবে আর আপনি অনুধাবন করবেন যে আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রত্যেক চিন্তা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত। তিনি জানেন আপনি মুখে যা বলছেন অন্তরেও সেই মতই ধারণ করেন কি না নাকি সেগুলো কোন স্বার্থের বেড়াজালে আবদ্ধ।"**

সম্মানিত হুযূর বলেন যে, একটি বিষয় যা প্রতি বছরই শূরায় আলোচিত হয় তা হল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্ষিক বাজেট। যেহেতু জামা'তের তহবিলসমূহ পুরোপুরিই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর থেকে

আসে। সম্মানিত হুযূর বলেন যে, বাজেটের ভিত্তি 'নূন্যতম সম্পদ; সর্বোচ্চ ব্যবহার'-এ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক মূলনীতির ওপর হওয়া উচিত। তিনি বলেন যে, যে স্পৃহার সাথে আর্থিক কুরবানী করা হয়েছে তা কখনো বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন: **"সকল কর্মকর্তা বা যারাই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অর্থ বরাদ্দ বা ব্যয় করে থাকেন, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন্ চেতনার সাথে এ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। কখনো কখনো, আহমদীরা নিজ প্রয়োজন বা চাহিদাকে অপূর্ণ রেখে নিজেদেরকে কষ্ট বা কাঠিন্যের মধ্যে নিপতিত করে যেন জামাতের চাহিদা পূরণ হতে পারে।"**

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন: **"যদি আহমদী মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র জামা'তের খাতিরে এমন আন্তরিক কুরবানী করে থাকেন আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে বরণ করে নেন তবে যারা কর্মকর্তা আর যারা বাজেট প্রস্তুত করেন, তাদের অবশ্যই অত্যন্ত মনোযোগের সাথে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত যে প্রতিটি পয়সা যথাযথ যত্নের সাথে ব্যয় করা হয় আর তার যথাযথ হিসাব রাখা হয়।"**

সম্মানিত হুযূর স্মরণ করিয়ে দেন যে ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণীকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন: **"যেভাবে আমি আমার খুতবাসমূহে বহুবার বলছি, মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে এক পূর্ণাঙ্গ, চিরন্তন শিক্ষা এবং নিখুঁত শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছিল। এরপর এটি মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগের জন্য নির্ধারিত ছিল যে, আধুনিক প্রযুক্তি, মিডিয়া ও অন্যান্য আধুনিক মাধ্যমে আগমনের সাথে এ উৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রচার তার চরম শিখরে পৌঁছবে।"**

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন: **"আমরা সেই সৌভাগ্যবান মানুষ যারা সেই আশীষমন্ডিত যুগে বাস করি যে যুগে শাশ্বত ধর্ম ইসলামের জন্য এর চরম শিখরে পৌঁছানো নির্ধারিত আর তাই আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাফল্য ও উন্নতির জন্য ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রচারে আমাদের প্রচেষ্টার মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। এটিই আমাদের ঐশী মিশন, সুতরাং একে কখনো হালকাভাবে নেবেন না।"**

সম্মানিত হুযূর বলেন যে, ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রসারের জন্য আহমদী মুসলিমদের সাহসী হতে হবে এবং বিরোধিতা সহ্য করতে সম্মত হতে হবে। এ কথা উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে 'মসীহ্ আবির্ভূত হয়েছেন' এ বিলবোর্ড প্রচারণার কিছু বিরোধিতা হয়েছে। সম্মানিত হুযূর বলেন যে, এমন বিরোধিতার ফলে আহমদী মুসলিমদের মনোবল দুর্বল হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন যে, সফলভাবে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য জ্ঞান ও সাহস তিনটিই থাকা প্রয়োজন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: **"আমরা যা-ই উপস্থাপনের জন্য চেষ্টা করি না কেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বা ইসলামের এমন কিছু বিরুদ্ধবাদী চিরকাল থাকবে যারা আমাদের সকল প্রয়াসকে নেতিবাচকভাবে দেখবে, কিন্তু এতে আমাদের পিছু হটা বা এমন লোকদের ভয়ে লুকিয়ে পড়া উচিত নয়। এটা কি সত্য না যে, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া, ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ এবং আরো কিছু দেশে আহমদী মুসলিমরা বড় বড় পরীক্ষা ও চরম বিরোধিতার মুখোমুখি?... কিন্তু, এর বিরোধিতা সত্ত্বেও, আমাদের আহমদী মুসলমানেরা ভীরুতা প্রদর্শন করে না, বরং তারা নির্ভীক চিত্তে নিজ বিশ্বাসের ওপর পূর্ণ ভরসার সাথে ক্রমাগত সামনেই অগ্রসর হতে থাকেন।"**

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন: **"কোন বিরোধিতার উদয় হলে ভীত হবেন না। এটি অন্ততঃপক্ষে এদিকে ইশারা করে যে এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে আমাদের বাণী পৌঁছাচ্ছে। আপনাদের তবলীগি প্রচেষ্টার সফলতার জন্য আপনাদের মাঝে সাহসিকতা থাকা আবশ্যক, আপনাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করতে হবে আর আপনাদের নিজ ধর্মের জ্ঞান থাকতে হবে। ইসলামের বাণীকে প্রচারের জন্য এগুলো হল মৌলিক উপাদান।"**

সম্মানিত হুযূর মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ ও তাকওয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দোয়ার মাধ্যমে তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন: **"সকল আহমদী মুসলমান, বিশেষ করে কর্মকর্তা ও শূরার সদস্যগণের জন্য সব সময় সকল প্রকার পাপাচার থেকে বিরত থাকা ও তাক্ওয়ার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা আবশ্যক। পরিশেষে আমি দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এ তৌফিক দান করেন যেন আপনাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আপনারা পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারেন।"**

[শুরায় প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর পূর্ণ ভাষণ আগামী সংখ্যায়]

সংবাদ

সংকলন: মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

পবিত্র রমযান ও ঈদু-উল-ফিতর ২০১৮-এর বিভিন্ন কর্মসূচী সফলতার সাথে সম্পন্ন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক গত রমযান ও ঈদুল ফিতর-২০১৮ এর বিভিন্ন কর্মসূচী অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়। পবিত্র মাহে রমযানে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়। রমযানে জামাতের ৫টি হালকার ৩টি স্পটে তারাবীহ নামায আদায় করা হয় যার গড় উপস্থিতি ছিল প্রত্যহ ৩৩০ জন। উল্লেখ্য যে এই বৎসর আহমদী পাড়াস্থ বায়তুল ওয়াহেদ মসজিদে খতমে তারাবীহ নামায অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫টি হালকার ২টি স্পটে দরসে কুরআন ও ইফতারির ব্যবস্থা ছিল যার গড় উপস্থিতি ছিল প্রত্যহ ২০০ জন। ৫টি হালকার ২টি স্পটে শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ শিক্ষার ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল যার গড় উপস্থিত ছিল ৩০ জন। উল্লেখ্য যে এই বৎসর ২ জন আনসার ভ্রাতা কুরআন শিক্ষা লাভ করেন। এ ছাড়া সারা রমযান মাসব্যাপী তাহরিকে ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা উত্তোলন করা হয়। উত্তোলনের হার শতকরা ৯০ ভাগ। এছাড়া ২২০ জন মৃত ব্যক্তির নামে তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে তাহরিকে জাদীদের চাঁদা আদায় করা হয়। রমযান মাসে অত্র জামাতের ২২০ জন সদস্য/সদস্যা কুরআন পাঠ খতম করে। জামাতের ২টি হালকা আহমদী পাড়া ও মৌড়াইলে সর্বমোট ১২ জন রমযানে ইতেকাফ করেছেন। ২৯ রমযানে ৫টি হালকা একত্রীতভাবে বায়তুল ওয়াহেদ মসজিদে ইজতেমায়ী দোয়া ও ইফতারির ব্যবস্থা করা হয় যার উপস্থিতি ছিল ১০০০ জন (প্রায়)।

ঈদ-উল-ফিতরের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। যার মধ্যে ছিল মসজিদ ওয়াকারে আমল ও সাজসজ্জা করা, ঈদ ফান্ড আদায়, ঈদের নামাযের পর কবর জিয়ারত ও ইজতেমায়ী দোয়া। ঈদের নামায ও কবর জিয়ারতের পর আসর পর্যন্ত ৫টি হালকায় ৬টি টিম প্রত্যেক আহমদীর ঘরে ঘরে গিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে শিশুদের মাঝে চকলেট বিতরণ করা হয় সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০টি। এছাড়া রোগী ও বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাত করা হয়। সারাদিন ব্যাপী ঈদের বিভিন্ন কর্মসুচি পালন শেষে মৌলভীপাড়া মসজিদুল মাহদীতে আসর নামায আদায় করা হয়। নামাযের পর হযরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) এর কবর জিয়ারত করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে ৬০ জন অংশগ্রহণ করেন এবং শেষে সবাইকে আপ্যায়ণ করা হয়। সবশেষে মাগরীবের নামাযের পর জামাতের পক্ষ থেকে শিমরাইলকান্দি/মৌড়াইল পুরাতন কবরস্থানে গিয়ে পূর্বপুরুষদের কবর জিয়ারত করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিল ১০ জন। ইত্যাদি কর্মশেষে দিনব্যাপী ঈদ-উল-ফিতরের কর্মসূচির সমাপ্তি হয়।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার
জেনারেল সেক্রেটারী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকায় ঈদুল ফিতর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান উদযাপন

গত ২২-৬-২০১৮ রোজ শুক্রবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব গিয়াস উদ্দিন সাহেবের বাসায় দিনব্যাপী ঈদুল ফিতর পুনর্মিলন অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। হালকার সকল সদস্য উপস্থিত হয়ে এই ঈদুল ফিতর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানকে আনন্দ মুখর করে তোলে। উক্ত হালকার লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবা তাহমিনা কাজল উপস্থিত লাজনাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মধ্যাহ্ন ভোজে সবাই অংশগ্রহণ করেন। পার্শ্ববর্তী অ-আহমদী বন্ধুদের বাসায় দুপুরের খাবার বিতরণ করা হয়। হালকার সদস্যগণ একে অপরের সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক ও ধর্মীয় আলোচনায় সময় কাটান। এই অনুষ্ঠান যেন সবাইকে নতুন রূপে ভ্রাতৃত্ববোধের মিলন মেলায় পরিণত করেছে। সবাই জামাতের সাথে আছর নামায আদায় করেন। নযম পরিবেশন করেছেন হালকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব খালিদুর রহমান ভুইয়া সাহেব, উক্ত হালকার প্রেসিডেন্ট সাহেব সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং আন্তরিক শভেচ্ছা জানিয়ে মহান আল্লাহ্‌র নিকট শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকা

ঘাটুরা জামাতের উদ্যোগে মুসীয়ান সম্মেলন-২০১৮ পালিত

গত ১১ মে, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসিলম জামাত ঘাটুরার উদ্যোগে মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুছা মিয়া সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশন এর মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের ওসীয়্যত এর গুরুত্ব, ওসীয়্যত ও চাঁদার সম্পর্ক, মুসী-মুসীয়ানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, আসল আমদ ফরম পূরণে দিক নির্দেশনা, স্থানীয় জামাতের মুসীয়ানদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রত্যেক মুসীয়ানদের ব্যক্তিগত ফাইল সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন, জনাব এস, এম হাবিবউল্লাহ্ সাহেব, সমাপণী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে মুসীয়ান সম্মেলন ২০১৮ সমাপ্ত হয়। উক্ত মুসীয়ান সম্মেলনে মোট ৪৭ জন মুসী-মুসীয়ানদের মধ্যে ২৫ জন মুসী ও ২০ জন মুসীয়ান উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকল মুসী মুসীয়ানদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা ছিল।

মুহাম্মদ মুছা মিয়া
প্রেসিডেন্ট

বিভিন্ন জামা'তে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে খেলাফত দিবস পালিত হয়

নারায়ণগঞ্জ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে গত ২৭ মে ২০১৮ তারিখ রোজ রবিবার বাদ আসর খেলাফত দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব কাউসার আহমদ ভূইয়া। উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি জনাব ফজল মাহমুদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব তৌফিক আহমদ। খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব এনামুর রহমান আফ্রাদ। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর খলীফাগণের জীবনী-এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব শামীম আহমেদ। "খলীফা আল্লাহ্ নির্বাচন করেন"– এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলানা তাহের আহমদ মুরুব্বী সিলসিলা। সভাপতির ভাষণ ও সমাপ্তি দোয়া পরিচালনা করেন জনাব ফজল মাহমুদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। অনুষ্ঠানে মোট উপস্থিতি ছিল ১৩০ জন।

ফজল মাহমুদ, আমীর

তেবাড়িয়া

গত ২৭ মে বাদ আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে মসজিদ হাশেমে খেলাফত দিবস পালন করা হয়, উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম নওশাদ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ এবং প্রেসিডেন্ট তেবাড়িয়া জামাত। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সাইফুল ইসলাম সেলিম। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব নাফিজুর রহমান। খিলাফত দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন জনাব এলাহি আল আমীন সবুজ, জেলা কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেবাড়িয়া, নাটোর। এরপর খেলাফত দিবসের গুরুত্ব ও কল্যাণ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব হামজা আমীর আলী, খেলাফত দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব প্রফেসর আব্দুল মতিন সাহেব এবং জেড, এম, এ রাজ্জাক সাহেব। অবশেষে সভাপতি মোহতরম নওশাদ আহমদ মুরব্বী সিলসিলাহ বক্তব্য রাখেন। তিনি খেলাফতের গুরুত্বকে সামনে রেখে প্রত্যেক আহমদী সদস্য/সদস্যার করণীয় কি এবং এ খলীফার সাথে প্রত্যেক আহমদীর যোগসূত্র থাকা আবশ্যক তুলে ধরে সাবলিল ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১১০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নওশাদ আহমদ, প্রেসিডেন্ট

কটিয়াদীর বৈরাগিরচর হালকা

গত ২৯/০৫/২০১৮ তারিখ রোজ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদীর বৈরাগিরচর হালকায় ২৭ মে খেলাফত দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোয়াজ্জেম হুসেন, হালকা প্রেসিডেন্ট বৈরাগির চর হালকা, অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন জনাব মোখলেছুর রহমান। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ইসমত উল্লাহ্ মিয়াজী। এরপর উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাইমিনুর রহমান, খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এ বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন মোখলেছুর রহমান, এরপর খেলাফত এক মহান ঐশী নেয়ামত এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ইসমত উল্লাহ্ মিয়াজী। অতঃপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন তিফল সিয়াম আহমদ। এরপর সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে খেলাফত দিবসের কার্যক্রম শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হালকার ১৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ইসমত উল্লাহ্ মিয়াজী, বৈরাগীর চর হালকা

চান্দপুর চা বাগান

গত ২৭/০৫/২০১৮ চান্দপুর চা বাগান জামাতের উদ্যোগে বায়তুস সামী মসজিদে বাদ আসর জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা করা হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াদত করেন জনাব হাশেম আহমদ চৌধুরী (আরাফ), নযম পরিবেশন করেন জনাব ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী (রাসেল) দিবসটির গুরুত্বের ওপর বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মাহমুদ আহমদ চৌধুরী, দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী, সাদিক আহমদ চৌধুরী সিয়াম ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। সবমেষে সভাপতির বক্তৃতার পর দোয়ার মাধ্যমে, অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়। এতে একজন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট

সোহাগী

গত ১৫/০৬/২০১৮ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সোহাগীর উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত হয়। উক্ত জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব এস. এম. মাহমুদুল হক এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন

থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সোহাগ আহমদ। কাসিদা পাঠ করেন মোছাঃ হালিমা, মোছাঃ বেদানা, মোছাঃ রেহেনা, মোছাঃ আমেনা।

ঐশী খিলাফত, খিলফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন যথাক্রমে জনাব আব্দুল হান্নান ও এস, এম, মহামুদুল হক। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৩২ জন আহমদী ও ২ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

এস. এম. মাহমুদুল হক
প্রেসিডেন্ট

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফাজিলপুর

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে গত ২৯/০৬/২০১৮ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় যয়ীম জনাব মুহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খান সাহেবের সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নূরুদ্দিন বাদল। নযম পরিবেশন করেন জনাব মাগফুর আহমদ। খেলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খান সাহেব। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
মজলিস আনসারুল্লাহ্, ফাজিলপুর

ভাতগাঁও

গত ১ জুন ২০১৮ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভাতগাঁও এর উদ্যোগে মসজিদুল মাহদীতে ঐতিহাসিক খেলাফত দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহতী সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুর রশিদ, প্রেসিডেন্ট। কুরআন তেলাওয়াত করেন মাসরূর আলম খান প্রভাত। নযম বাংলা পরিবেশন করেন আতিকুর রহমান ও তৌফিক আহমদ। ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মনির হোসেন খান ও মিজানুর রহমান মোয়াল্লেম। খেলাফতের কল্যাণ ও বঞ্চিতদের অবস্থান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলবী শাহ আলম খান, মোয়াল্লেম, ভাতগাঁও জামাত। সবশেসে প্রেসিডেন্ট সাহেবের নসিহতমূলক বক্তব্য রেখে দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়। এতে ১০৫ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মৌলবী শাহ আলম খান, মোয়াল্লেম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরা

গত ৩০/০৬/২০১৮ তারিখ রোজ শনিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরমা রুবী দুলাল, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঘাটুরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহতরমা ঝুমারা জান্নাত। খেলাফত বিষয়ে উর্দু নযম পরিবেশন করেন জান্নাতুল বাকী এবং আমাতুশ শাফী। প্রবন্ধ পাঠ করেন সায়মা আহমদ। আরবি কাসিদা পাঠ করেন সাথী আহমদ। খেলাফত দিবসের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কাজলরেখা। "ইসলামের প্রথম খলীফা এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রথম খলীফার সাদৃশ্য" এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন পলী হাজারী। বাংলা নযম পরিবেশন করেন শারমিন শিমুল এবং আঁখি আক্তার। "খলীফা আমাদের প্রাণ" বিষয়ে বলেন, মোবাশ্বেরা সেলিম। হুযূর (আই.)-এর খুতবার আলোকে খেলাফতের গুরুত্ব তুলে ধরেন মাসুদা সুলতানা। সভাপতি সাহেবার বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত দিবসে উপস্থিতি ছিল ৬০ জন।

রুবি দুলাল
প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্

ময়মনসিংহে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে প্রথম রিজিওনাল ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৯-৩০/০৬/২০১৮ তারিখ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ময়মনসিংহের প্রথম রিজিওনাল ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় ১২টি মজলিসের মোট ৫১ জন সদস্য উপস্থিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব ওমায়ের আহমদ (অপু)। বিভিন্ন দলের মাঝে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, লিখিত পরীক্ষা, কুইজ, মোরগ লড়াই ও ফুটবল ইত্যাদি প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মধ্যেপুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে সফলতার সাথে ইজতেমা সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

জি. এস. ও রিজিওনাল কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ময়মনসিংহ

সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ

গত ৩১/০৫/২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত "বীরমুক্তি যোদ্ধা মেজবাহ্ উদ্দিন সাবু নৈশ বিদ্যালয়ে" পাঠরত সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের

মাঝে রমযান মাসে ঈদ উপহার ও ইফতার সামগ্রী বিতরণের এক কর্মসূচী পালন করা হয়। এখানে ১৮ জন লাজনা সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার প্রেসিডেন্ট সাহেবা মোহতরমা সাজেদা খাতুন। লাজনাদের পক্ষে মোহতরমা সেলিনা তবশির, মোহতরমা আয়েশা বেগম সাহেবা, মোহতরমা জিনিয়া জামাল এবং মোহতরমা সাজেদা খাতুন সাহেবা বক্তব্য রাখেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাও সৌজন্য বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে কিছু ছাত্র-ছাত্রী অনুভূতি প্রকাশ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ১২৬ জন ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ১২৬ পেকেট ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ইফতার সামগ্রী পেয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ খুশিতে অপ্লুত হয়। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও শিক্ষকগণ আমাদের মানবসেবা কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। আমরা যেন প্রতি বছর আমাদের এই ধরণের কার্যক্রম ব্যবস্থা অব্যাহত রাখি তার অনুরোধ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে মিনাবাজার অনুষ্ঠিত

গত ২০/০৪/২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে সকাল ১০ টায় মোহতরমা সাজেদা খাতুন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে ও তাঁর সভাপতিত্বে 'মিনাবাজার' অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহতরমা রওশন জাহান সদর লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশ। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। অনুষ্ঠানে বিচারক এর দায়িত্ব পালন করেন মোহতরমা আমাতুল কাইয়ুম সাহেবা, নায়েব সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ, মোহতরমা নার্গিস আক্তার সাহেবা সেক্রেটারী লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ ও মোহতরমা সেলিনা তবশীর রুবী সাহেবা, ভাইস প্রেসিডেন্ট ঢাকা। মিনা বাজারে স্টল ছিল ১৪টি। এর মধ্যে ২টি নাসেরাত স্টল ছিল। স্টলে ছিল নানা ধরণের হাতের তৈরি পিঠা, পায়েশ, নকশি পিঠা, তৈল পিঠা, পোয়া পিঠা, মাংস পিঠা, চটপটি, তেহারী, বিরয়ানী, খিচুরি, আচার ও শরবত ইত্যাদি খাবার সামগ্রী। এছাড়া নানা ধরণের হাতের তৈরি যেমন সু পিচ জিনিস, খেলনা, ঝুড়ি, মালা, দুল, পোশাক, চাদর, কাঁথা ওয়ালমেট ইত্যাদি। অনুষ্ঠানের শেষে বিচারক মন্ডলীর বিবেচনায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী হালকাকে পুরস্কৃত করা হয়। নাসেরাত ও লাজনাদের আলাদাভাবে পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিল ২০০ জন লাজনা নাসেরাত ও শিশু।

আমাদের প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার "খেদমতে খালক"-এর উদ্যোগে "প্রবীণ নিবাস" পরিদর্শন

গত ০৫/০৬/২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার খেদমতে খালক এর উদ্যোগে উল্লেখিত লক্ষ্যে "প্রবীণ নিবাস" পরিদর্শন করা হয়। এর সার্বিক বিষয়ের নিগরানীতে ছিলেন লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার প্রেসিডেন্ট সাহেবা, মোহতরমা সাজেদা খাতুন। এতে অংশগ্রহণকারী লাজনা ছিলেন, নায়েব সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ মোহতরমা মরিয়ম সুলতানা, মোহতরমা সাজেদা খাতুন লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা, ভাইস প্রেসিডেন্ট ঢাকা রহিমা জাকির, ভাইস প্রেসিডেন্ট ঢাকা মালেকা পারভীন, মোহতরমা আয়েশা খাতুন, মোহতরমা সিদ্দিকা, মোহতরমা শাহাজাদী রোকেয়া, ঢাকার লাজনা টিম প্রবীণদের সাথে প্রবীণ নিবাসে সময় কাটিয়েছেন।

কবিতা, প্রবন্ধ রচনা, ডিকশনারী, গল্প উপন্যাস ও পবিত্র কুরআন শরীফ, হাদীস বহি সহ প্রায় ২১০টি বই প্রবীণ নিবাসের লাইব্রেরীতে গিফট হিসেবে প্রদান করা হয়। উক্ত বইগুলো রাখার জন্য দুটি বুকসেল্ফ এবং তাদের অবসর বিনোদনের জন্য ১টি টেলিভিশন গিফট দেওয়া হয়। বৃদ্ধা মা বোনেরা এতে আনন্দিত হন।

শাহজাদী রোকেয়া
ইশায়াত সেক্রেটারী, ঢাকা

তেজগাঁও এর উদ্যোগে "খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দিনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর" পুস্তকের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ মজলিস আনসারুল্লাহ্ তেজগাঁও এর উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত "খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দিনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর" পুস্তকের উপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পুস্তকটির ওপর বিশদ আলোচনা করেন মোহতরম মোহাম্মদ কায়সার আলম সাহেব। উপস্থিত স্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মোহতরম স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, যয়ীম আলা ও মোয়াল্লেম তৌহিদ আহমদ সাহেব। অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের আহমদীদের ২০ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রাণবন্ত খোলামেলা পরিবেশে উক্ত কিতাবের ওপর সবাই মিলে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেন।

মোহাম্মদ কায়সার আলম
সদস্য, তেজগাঁও

*** শুভ বিবাহ ***

গত ০৪/০৫/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ রেখা বেগম, পিতা- রাহেন উদ্দীন খলিফা, ৫৮/৩৪, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪ এর সাথে মামুনুর রহমান কানু চৌধুরী, পিতামৃত- মোহাম্মদ আব্দুল মন্নাফ চৌধুরি, গ্রাম-জামালপুর, পোঃ শাকিল মোহাম্মদ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৮৬।

গত ২৭/০৪/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ নাঈমা ফেরদৌস, পিতা- মোহাম্মদ রবিউল হোসেন, ১০/১০-১, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা এর সাথে মীর মোসাব্বের আলী, পিতা-মীর মোনাব্বের আলী, ১৩৭/এ, পশ্চিম উলন, রামপুরা, ঢাকা- এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৮৭।

গত ১৩/০৪/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ আসমা হাবিব, পিতা- মোহাম্মদ আহসান হাবিব, গ্রাম-মাজদিয়া, ডাকঘর-ধাপাড়ী, থানা- ঈশ্বরদী, জেলা-পাবনা-এর সাথে মোহাম্মদ গোলাম রসূল, পিতা-মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, গ্রাম মিরগাং, ডাকঘর-যতীন্দ্রনগর, থানা-শ্যামনগর, জেলা সাতক্ষীরা- এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৮৮।

গত ১৩/০৪/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ নাঈমা নাস্‌রিন বৃষ্টি। পিতা- নাসির আহমেদ, গ্রাম-শালশিড়ী, পোঃ ফুলতলা হাট, থানা- বোদা, জেলা-পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ রুস্তম আলী, পিতা-মোহাম্মদ আবদুল খালেক, গ্রাম-তালুক কল্যাণী, পোঃ- বড়দরনা হাট, পীরগাছা, রংপুর এর বিবাহ ১,৭৫,০০০/- (একলক্ষ পচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৮৯।

গত ১২/০১/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ জেরিন রায়হানা মৌমিতা, পিতা- মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, ৪১১/১, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ সাদেকুল ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ কামাল পাশা, ৫৩৬, আনোয়ার জং রোড, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪১ এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৯০।

গত ১১/০৫/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ সেলিনা জাহান (পুরবী)। পিতা : মোহাম্মদ জামিলুর রহমান, শান্তিবাগ, মালতিনগর, বগুড়া (সদর) বগুড়া-এর সাথে মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন মস্তান (রাহাদ), পিতার নাম : মোহাম্মদ শরীফ আহমদ মস্তান, বাড়ী-৬, লেন-২, রোড-১ পশ্চিম নন্দিপাড়া, ঢাকা-১২১৯ এর বিবাহ ৫,০০,০০১/- (পাচলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৯১।

গত ১৫/০৫/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ সামিমা আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ দ্বীন ইসলাম, গ্রাম–শালশিড়ি, পোঃ ফুলতলা, থানা- বোদা, জেলা পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, পিতামৃত : ইসলাম মিয়া এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৯২।

গত ১৫/০৫/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ রিপনা আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, গ্রাম-শালমিড়ি, পোঃ ফুলতলা, থানা-বোদা, জেলা-পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ আল-আমিন আহমদ (রাজু), পিতা- মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, গ্রাম দেওয়ান টুলি, পোঃ মাহিগঞ্জ, জেলা-রংপুর-এর বিবাহ ১,০৫,০০০/- (একলক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৯৩।

গত ২৭/০৪/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ রিমা আক্তার, পিতামৃত: হাসান আলী, গ্রাম-টেক্সদিঘীরপাড়, থানা-মাহিগঞ্জ, জেলা-রংপুর-এর সাথে মোহাম্মদ মেহেদী হাসান, পিতা- লুৎফর রহমান, গ্রাম:পূর্ব কোমর নই, গাইবান্ধা সদর- এর বিবাহ ১,৪০,০০০/- (একলক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৯৪।

গত ২৭/০৪/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ আক্‌লিমা আক্তার, পিতামৃত- আব্দুর রশিদ খান, কান্দিপাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে কাউসার আহমদ, পিতা জনাব মালু মিয়া, গ্রাম- বেবুদী, তারুয়া, আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া- এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৯৫।

গত ১১/০৪/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ স্নিগ্ধা রহমান, পিতামৃত-জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, আহমদনগর জেলা-পঞ্চগড়-এর সাথে নাজমুস সাকিব (বাপ্পী) পিতা- মোহাম্মদ রাকীব হোসেন, আহমদনগর, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৯৬।

গত ০৯/০৬/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ ফায়েজা রহমান (সামিয়া), পিতা-জনাব মোখলেছুর রহমান, তারুয়া, (কটিয়াদী জামাত) আশুগুঞ্জ-এর সাথে জনাব ইসমত উল্লাহ মিয়াজী, পিতা-জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, তারুয়া, (কটিয়াদী জামাত) আশুগুঞ্জ-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৯৭।

গত ১৭/০৬/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ মরিয়ম পারভীন, পিতা- মোহাম্মদ আনিছুর রহমান তরফাদার, গ্রাম-বড়ভেটখালী, পোঃ যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাথে জি, এম, মনিরুজ্জামান, পিতা-জি, এম, নূরুজ্জামান, গ্রাম-বড়ভেটখালী, পোঃ যতীন্দ্রনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১,২৫,০০০/- (এক লক্ষ পাঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৯৮।

গত ১৭/০৬/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ আরজিনা আক্তার, পিতা-জনাব মোহাম্মদ সাহাদত হোসেন, ভাব রংগী, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ বশির আহম্মেদ, পিতা- মোহাম্মদ মুসলেম উদ্দীন, বড়ভেটখালী, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১,৪৯,০০০/- (এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার, নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪৯৯।

শোক সংবাদ

আমরা অতীব দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নূরনগর ঈশ্বরদী এর প্রবীণ সদস্য ও জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, জনাব গিয়াস উদ্দিন মোল্লা গত ২০ জুন ২০১৮ তারিখ রাত ৯টার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ১৯৪২ সালে পাবনা জেলার অন্তর্গত ঈশ্বরদী থানার মাজদিয়া গ্রামের চর ধাপাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম প্রখর মেধাবী ও ধর্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সত্যপথ অনুসরণের জন্য সর্বদা সচেতন ছিলেন এবং বিভিন্ন দলমত নিয়ে গবেষণা করতেন। তিনি ১৯৫৮ সালে মেট্রিক পাশ করেছিলেন।

পরিশেষে তিনি আখেরী জামানায় ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের সংবাদ পান এবং ১৯৭৫ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জামাতের সাথে জড়িত থেকে অনেকের নিকট তবলীগ করেছেন এবং কয়েকজনকে বয়াত গ্রহণ করিয়েছেন। তাঁর পরিবারে, স্ত্রী, চার কন্যা এক পুত্র ও অনেক নাতি-নাতনি ও গুণগ্রাহী রেখে এ পৃথিবী হতে চির বিদায় নিয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর। আমরা সবাই তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। মহান আল্লাহ্ যেন তাঁর সকল অপরাধ ক্ষমা করতঃ তাঁকে জান্নাতবাসী করেন, আমীন।

মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান
প্রেসিডেন্ট

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

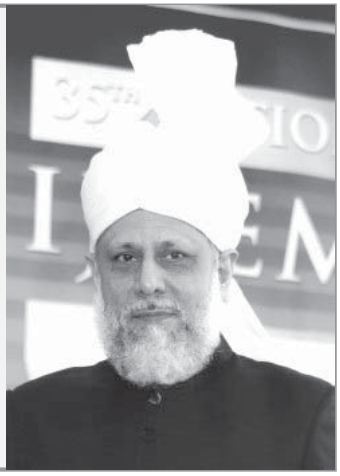

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ﴿۲﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۳﴾ وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۴﴾ وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ﴿۵﴾ وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুল নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۲﴾ مَلِکِ النَّاسِ ﴿۳﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿۴﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ﴿۵﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَ النَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন-

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? কখনো না ! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করোনা ! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া ! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা ! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা, সে জীবিত নয়, মৃত।”

(হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২১৫)

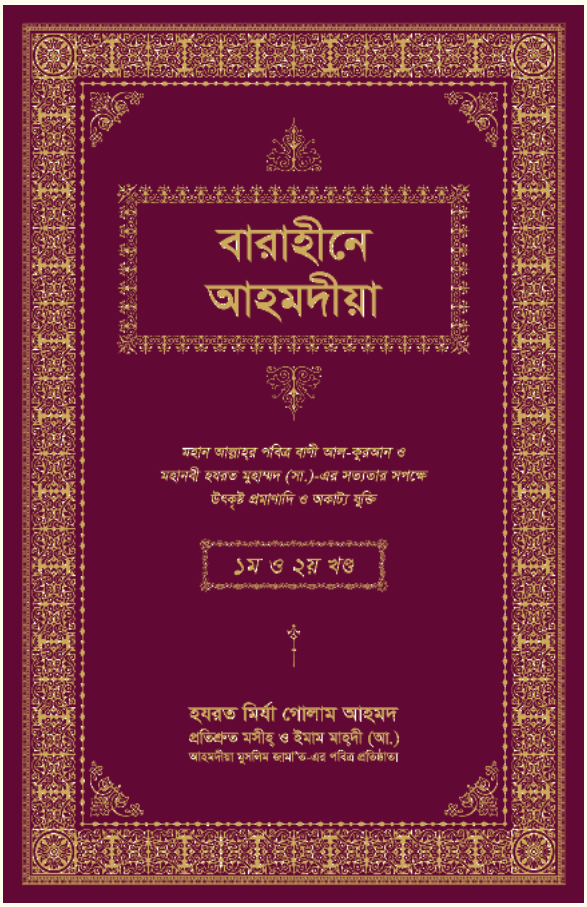

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

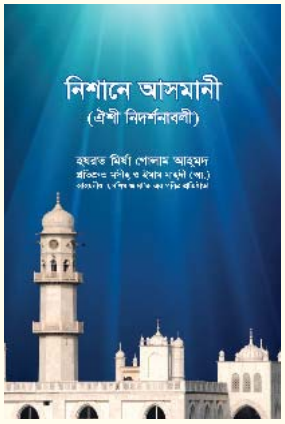

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্‌দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

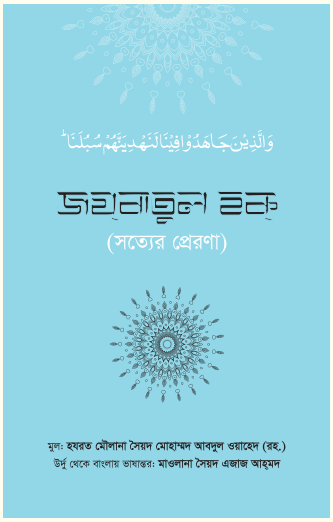

জয্‌বাতুল হক্ব (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- টাকা মাত্র।

New Vol. No. 81 | 1st Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th July, 2018 ■ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

‘সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে নিজের প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁহার সহিত মিলন সাধন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া খোদার আদেশ লঙ্ঘন করে সে কখনো বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারে না।’

(কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃ-৩৮)

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

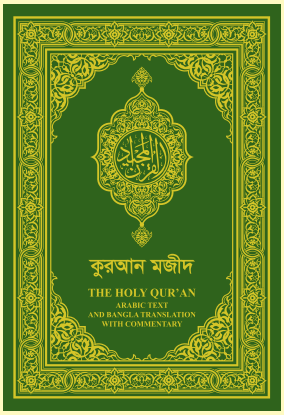

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশের সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সহজবোধ্য আরবি অক্ষরে নতুন করে **পবিত্র কুরআন শরীফ** মুদ্রিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইশায়াত দপ্তরে এর পর্যাপ্ত সংখ্যক কপি সংরক্ষিত আছে। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণকে **পবিত্র কুরআন শরীফ** সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। কুরআন শরীফের হাদীয়া নির্ধারণ করা হয়েছে– **৫০০/-** (পাঁচশত টাকা)।

নিবেদনান্তে–
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত

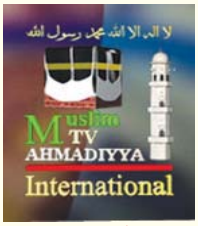

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama’at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)